আদর্শ জীবনী

(শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত)

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী প্রণীত।

কলিকাতা:
২৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
হরিমোহন লাইব্রেরী
হইতে
শ্রীমন্মথনাথ গোস্বামী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ॥• আনা মাত্র।

Printed by A, Gafur, New Britannia Press
78, Amherst Street
CALCUTTA.





উৎসর্গ পত্র।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

যাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ও অপার

উৎসাহে আজি এই

গ্রন্থখানি সাধারণের

নিকট প্রকাশিত

হইল, আমার

সেই

দেবোপম

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

আন্তরিক ভক্তির সহিত উৎসর্গীকৃত হইল।

লেখিকা।

ভূমিকা।

১৩১৬

কোচবিহাররাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মাধ্যক্ষ পরমসম্মানভাজন শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর তাঁহার কন্যার রচিত এই গ্রন্থখানি দেখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন ; তদনুসারে আমি গ্রন্থখানি দেখিয়াছিলাম এবং গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইচ্ছামত সংশোধন বা পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আমার উপর অর্পিত থাকিলেও অধিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দেখি নাই ; স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধনের জন্য গ্রন্থকর্ত্রীকে যে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহা পালিত হইয়াছে। স্থূলতঃ গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্রীর নিজস্ব ; আমার অনবধানে যদি কোন ত্রুটি অসংশোধিত হইয়া থাকে, পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমার অবকাশের যেরূপ অভাব, তাহাতে সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, বলিতে পারি না।

বাঙ্গালাদেশের কতিপয় মহাপুরুষের জীবনচরিত এই গ্রন্থে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহা সঙ্কলনমাত্র। যাঁহারা ঐ সকল মহাপুরুষচরিতের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত আছেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কোন বিশেষ নূতন কথা পাইবেন না। সঙ্কলন গ্রন্থ মধ্যেও এখানি হয়ত অদ্বিতীয় নহে ; তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যে জীবনচরিত গ্রন্থের সংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাতে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাও সেই বিরল সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইবে এবং সাধারণের উপকারে আসিবে এই বিশ্বাসে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশের জন্য গ্রন্থকর্ত্রীকে আমি উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আশা করি সাধারণে ইহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।

আনন্দের বিষয় যে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীর

অভাব নাই। তবে অধিকাংশ স্থলেই মহিলাগণ সাহিত্যের কাব্যাংশের আলোচনাতেই নিযুক্ত আছেন। সাহিত্যের অন্যান্য অংশে তাঁহাদের প্রযত্নও বিশেষভাবে আদরের যোগ্য হইবে। এই কারণেও আমি এই গ্রন্থখানি সম্যক্ সমাদরের উপযুক্ত বোধ করি।

যে সকল মনস্বী মহাজন বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের গঠনকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, এই গ্রন্থে বিশেষতঃ তাঁহাদেরই কীর্ত্তিকথা বিবৃত হইয়াছে। দৈনন্দিন জপমালা ঘুরাইবার সময় তাঁহাদের নাম স্মরণীয় ও উচ্চার্য্য। তাঁহাদের চারিত্রপঞ্জিকা আমাদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবে; তাঁহারা যে নূতন ভাবের উৎস খুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনের স্রোতস্বতীকে তরঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ভাবের আঘাত আমাদের জীবনের গতিতে বেগদান করিবে। এই সকল মহাপুরুষের নামের কীর্ত্তনে ও স্মরণে পুণ্যসঞ্চয় হয়, ইহা অত্যুক্তি নহে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যাঁহাদের গৃহে রক্ষিত হইবে, তাঁহাদের সেই পুণ্যসঞ্চয়ে কতকটা সুযোগ ঘটিবে, ইহাতে দ্বিধা করি না।

১৮৯৮ খৃঃ ২৭ জুন — শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কৃতজ্ঞতাপত্র।

ভারতবর্ষের শ্রদ্ধাস্পদ এবং সর্ব্বজনপূজ্য, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক ও সাহিত্যসেবী মহাজনগণের আদর্শজীবনী আমি বহুদিন হইতে পাঠ করিতেছি। পাঠান্তে আমার মনে এই ইচ্ছা বলবতী হয় যে, আমাদের স্বদেশীয় বালকবালিকাগণের চরিত্রগঠন ও সাহিত্যচর্চ্চার উচ্চাভিলাষ মনে প্রবলরূপে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে মহাজনগণের জীবনী যত সংক্ষেপে হইতে পারে সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিব।

এই উদ্দেশ্যে আমি মহাত্মা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয়ের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত জীবনী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রণীত ৺অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত গবেষণাপূর্ণ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত ও খ্যাতনামা প্রাচ্য বিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ মহাগ্রন্থে অন্যান্য অনেক মহাত্মার জীবনী বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছি। আমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন গবেষণার শক্তি অতি অল্প; উপরোক্ত মহাত্মাগণের গ্রন্থগুলিই আমার একমাত্র অবলম্বন। সেইজন্য উক্ত মহাত্মাগণের নিকট আমি সরলভাবে ও সর্ব্বান্তঃকরণে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইহাঁদের গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ সম্মুখে না থাকিলে, কোনও ক্রমেই আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারিত না। এস্থলে আমার আর একটী ব্যক্তব্য আছে। আমার সঙ্কলন ও সংগ্রহের অনেক স্থলে আমার পঠিত গ্রন্থ সমূহের ব্যবহৃত অনেক কথা ও বাক্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি নিজের কথা ব্যবহারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অনেক স্থলে গ্রন্থাদির কথা সম্যক্ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি একান্তমনে ভরসা ও প্রার্থনা করি যে সহৃদয় উপরোক্ত গ্রন্থকারগণ আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করতঃ আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

স্বনামধন্য সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকটেও আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। তাঁহার প্রদত্ত উৎসাহ ও উপদেশ আমার অনেক উপকার হইয়াছে; এবং তিনি আমার সংকলিত এই আদর্শ জীবনী পাঠ, সংশোধন ও, অনেক অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত করাইয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির ভূমিকা তাঁহারই লিখিত।

লেখিকা।

সূচীপত্র।

কৃত্তিবাস	১
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী	৫
কাশীরাম দেব	১০
ভারতচন্দ্র রায়	১৮
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২৪
রাধাকান্ত দেব	২৯
দীনবন্ধু মিত্র	৩৩
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩৭
প্যারীচরণ সরকার	৫২
অক্ষয়কুমার দত্ত	৬৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৭৯
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১০২
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১২
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১১৭
রাজনারায়ণ বসু	১৩৫

অশুদ্ধি সংশোধন।

২৬	পৃষ্ঠায়	৯ম	লাইনে	১২৮৭	স্থলে	১২৩৭	হইবে
২৬	„	১১শ	„	১২৫..		১২৩৯	„
৩০	„	৭ম	„	১৮৬১		১৮১৬	„

আদর্শ জীবনী।

কৃত্তিবাস।

কত শতাব্দ গত হইয়াছে কৃত্তিবাস এ ভারত হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রামায়ণ তাঁহাকে এই মরজগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি স্বরচিত ভাষা রামায়ণে যেরূপ নিজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় তিনি একজন কবি, একজন পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী এবং ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী। তাঁহার সময় ফুলিয়া গ্রাম বোধ হয় বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এই নিমিত্তই ফুলিয়াকে "স্থানের প্রধান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ফুলিয়া গ্রাম শান্তিপুরের নিকট। কবি ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন প্রসঙ্গে আকনা, -মাহেশ, মেড়তলা, খড়দহ, নদীয়া, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া।
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥"

আদিকাণ্ড।

এখন কথা হইতেছে, কৃত্তিবাস নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিলেন, অথচ নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের নাম উল্লেখ করিলেন না, খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুর নামও তুলিলেন না, এমন কি কবির জন্মভূমি ফুলিয়া

নিবাসী কঠোরতপা হরিদাসের নামটী মাত্রও করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় যে তিনি চৈতন্য প্রভৃতির পূর্ব্বে আবির্ভূত হন এবং তাঁহার সময়েও নবদ্বীপে খ্যাতনামা পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল।

বর্ত্তমানকালে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ফুলিয়া মেলের জন্য ফুলিয়া গ্রাম বিখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্যকারিকা পাঠে জানা যায়, মেলপ্রবর্ত্তক দেবীবর চৈতন্য দেবের এবং ফুলিয়ামেলের প্রথম গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য দেবীবরের সমসাময়িক। কুলপঞ্জিকার মতে গঙ্গানন্দের প্রপিতামহের নাম অনিরুদ্ধ। এই অনিরুদ্ধের পিতার নাম মুরারি ওঝা, ভ্রাতার নাম বনমালী। কৃত্তিবাস নামে বনমালীর এক পুত্র জন্মে।

উক্ত মুরারি ওঝার পৌত্র ও বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস ভাষা রামায়ণ প্রণেতা। কবিও নিজে আপনাকে মুরারি ওঝার নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

এই মুরারি ওঝা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন।

কুলপঞ্জিকানুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আমিত্তের অধস্তন অষ্টম পুরুষে এবং গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের উর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। এরূপস্থলে রাজা লক্ষ্মণসেনের ন্যূনাধিক ২৫০ বর্ষ পরে এবং চৈতন্যের সমসাময়িক গঙ্গানন্দের ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল স্থির করিতে হয়। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে যে বেদানুজ রাজা উল্লিখিত দেখা যায়, তিনি কে তাহা জানা যায় নাই, তবে কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নৃসিংহ ওঝার পিতামহ ঔধোদানোজা মাধব রাজার সভাসদ ছিলেন, তাহা কুলজী গ্রন্থে পাওয়া যায়। উধো ১২৮০-১৩৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন, কৃত্তিবাস উধো হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ, সুতরাং ১২৮০ খৃষ্টাব্দের প্রায় ২০০ বৎসর পরে কৃত্তিবাসের প্রৌঢ়াবস্থা ধরা যাইতে পারে। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খানকে লইয়া ১৪৮০ খ্রীঃ অঃ মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়, এই সময়ে

কৃত্তিবাসের বিদ্যমান থাকা সম্ভব। কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন, ইনি তাহিরপুরের বিখ্যাত রাজা কংশনারায়ণ। কবির আত্ম-বিবরণীতে তাঁহার রাজসভায় উপনীত হওয়া সম্বন্ধে এই কয় ছত্র দৃষ্ট হয়—

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
পঞ্চঘটী বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইলা দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
কার নাম কুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥

উক্ত কংশ রাজা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন। নৃসিংহ ওঝা যে রাষ্ট্রবিপ্লবে পড়িয়া নিজবাসস্থান ত্যাগে ফুলিয়াতে আসিয়া বাস করেন, উহা সম্ভবতঃ ফকিরুদ্দিন কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম অধিকারকালে (১৩৪৮ খৃঃ) সংঘটিত হইয়াছিল।

১৪৮০ খৃঃ কৃত্তিবাসের প্রৌঢ়াবস্থা প্রমাণিত হইলে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্মকাল স্থির করা অসঙ্গত হইবে না। কারণ কবি লিখিয়াছেন যে তিনি নিতান্ত বৃদ্ধাবস্থায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৪৪০ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবারে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন এবং কুলে শীলেও যে কবির বংশধরগণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহা নিম্নলিখিত ছত্র দুইটীতে জানিতে পারা যায়ঃ—

কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্যগুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

কাহারও মতে কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানিতেন না, তিনি মূল রামায়ণ দেখেন নাই, পুরাণ শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন; কিন্তু কৃত্তিবাস যে একবারেই সংস্কৃত জানিতেন না, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি আপনাকে প্রায় শতবার "পণ্ডিত" ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবি আত্ম-বিবরণীতে লিখিয়াছেন

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতির উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে॥

যে ব্যক্তি সংস্কৃত জানে না, তাহার লেখনী হইতে এ প্রকার অসম-সাহসী কথা বাহির হইতে পারে না। তাঁহার বর্ণিত অনেক কথা অদ্ভুত রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিপিতে আছে। একস্থানে কবি লিখিয়াছেন :—

"পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহ শুনি বাল্মীকির মতে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ কোন একখানি গ্রন্থের অনুবাদ নহে। উক্ত কারণে ইহার সহিত বাল্মীকির রামায়ণের বহু অনৈক্য দেখা যায়। পূর্ব্বে ভাষা রামায়ণের পাঁচালী গীত হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠে বোধ হয় তিনি সর্ব্বসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য ও আপন কবিত্ব প্রচারার্থে এমন

অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা আমরা প্রাচীন পুরাণাদি গ্রন্থে দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ কৃত্তিবাস যে প্রসিদ্ধ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি বিদ্যার গৌরবে অর্থস্পৃহা পরিহার করিতে সমর্থ ছিলেন। "পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥ কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা যাই তথা গৌরব মাত্র সার॥"

কৃত্তিবাস রচনার সরলতা, মধুরতা ও পরিহাস রসিকতায় খ্যাতনামা কবিদিগের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নহে। বাঙ্গালা ভাষার শৈশবাবস্থায় যাঁহার লেখনী হইতে এমন মনোমুগ্ধকর মধুর রচনা বাহির হইয়াছে, তিনি যে একজন অসাধারণ কবি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশে বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থপ্রণেতা। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সেলিমাবাদ থানার এলাকাধীন দমুন্যা নামক গ্রামে কবিকঙ্কণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের উপাধি ছিল "গুণরাজ"। এদেশে মুকুন্দরাম "কবিকঙ্কণ" নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছেন।

যে সময়ে মুসলমান শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে বঙ্গবাসিগণ উত্যক্ত বিরক্ত, সেই সময়ে কবিকঙ্কণও মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনঃকষ্টে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সমভিব্যাহারে বিদেশে পলায়ন করেন। তৎকালে তিনি পথে যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পলায়নকালের বিবরণ দামুন্যা ও

তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের পুঁথিতে এই কয়ছত্রে দৃষ্ট হয় এবং ইহাই প্রমাণিত হওয়ায় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

দামুন্তা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥

* * * *

তেলিয়া গাঁয়ে উপনীত রূপরায় নিল বিত্ত,
যদুকুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারিত কৈল ডর,
দিবস তিনের দিন ভিক্ষা॥
বাহিলুঁ গড়াই নদী সর্ব্বদা সঙরিয়া বিধি,
কেঁউটায় হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুল পুরী
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর পার হৈনু দামোদর,
উপনীত তেউটা নগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, উদক করিনু পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥

নানাস্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-ভূমি পরগণার মধ্যবর্ত্তী আড়রা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণরাজ বাঁকুড়া দেবের নিকট উপস্থিত হন। বাঁকুড়া দেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার নিকট রাখেন, এবং তথায় তিনি রাজপরিবারের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া দেবের পুত্র রঘুনাথ রায় এই ব্রাহ্মণ ভূমিতে কবিকে দশ আড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন। এই স্থানে মুকুন্দ-রাম পরমসুখে বাস করিয়া চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। কিন্তু কবি তাঁহার

নিজগ্রাম দামুন্যার চিত্রপট ও তাঁহার প্রান্তবাহিনী সুন্দর রত্নামুনদের মনোমুগ্ধকর মধুর দৃশ্য ভুলিতে পারেন নাই। "গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ জল, পান কৈনু শিশুকাল হইতে। সেই সে পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে"—বলিয়া রত্নানুনদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে কবি রাজা রঘুনাথের আদেশে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কাব্য চণ্ডী-মঙ্গল প্রচার করেন।

মুকুন্দরাম কয়ড়ী গাঞীর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ; তাঁহাকে লইয়া ছয় সাত পুরুষ দামুন্যা গ্রামে বাস। কবির পূর্ব্বপুরুষেরা বিষ্ণুর উপাসক ও কৃষিবৃত্তিধারী ছিলেন। দেবসেবা এবং কৃষিই তাঁহাদিগের প্রধান জীবিকা ছিল। চক্রাদিত্য নামে এক শিব গ্রাম্য দেবতা আছেন। কবি শৈশব হইতেই চক্রাদিত্যের প্রতি নিরতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। প্রত্যহ তাঁহার পূজান্তে চরণোদক পান করিতেন। মুকুন্দরাম কেঁউটা গ্রামে বিবাহ করেন এবং পিতৃপুরুষের অবলম্বিত কৃষিবৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। কবি তাঁহার ভ্রাতাদিগের সহিত মাণিকদত্ত নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই মুকুন্দরামের কবিত্ব শক্তি জন্মিয়াছিল এবং ইনি শিব সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কবি "সুকবি ও সুপণ্ডিতের" আবাস ভূমি বলিয়া দামুন্যা পল্লীর "সুধন্য দক্ষিণ পাড়ারই" বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। দামুন্যায় রক্ষিত মুকুন্দরামের হস্তলিখিত পুঁথিতে এই কয় ছত্র দৃষ্ট হয়: "কুলে শীলে নিরবন্ধ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান। অতিশয় গুণবাড়া, সুধন্য দক্ষিণ পাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান।"

কবির মাতার নাম 'দৈবকী', পুত্রের নাম 'শিবরাম', পুত্রবধূর নাম 'চিত্রলেখা', কন্যার নাম 'যশোদা' ও জামাতার নাম 'মহেশ' ছিল। এখনও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্দ্ধমানে রায়না থানার ছোট বৈনান গ্রামে ও দামুন্যা গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা কবিকঙ্কণের হস্ত-

লিখিত চণ্ডীমঙ্গলের পূজা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং পরে যে তিনি শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ও অনেক আচরণে বিশেষরূপে জানা যায়।

কবিকঙ্কণের সময় মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলেব শেষে লিখিত আছে—

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥"

এই কবিতার উপর নির্ভর করিলে ১৪৬৬ শকে চণ্ডীমঙ্গলের রচনা-কাল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, মানসিংহ যখন গৌড়বঙ্গ ও উৎকলের রাজা সেই সময়ই চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তিকাল।

কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম বাঙ্গালা ১০৪৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিলিমবাদ পরগণার মালীক বারাখাঁর নিকট হইতে ২০ বিঘা জমির সনন্দ পান।

জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে ১৫২৮ শকে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী পান, অতএব ১৫১১ শকের পর ও .৫২৮ শকের পূর্ব্বে কোন্ সময়ে কবিকঙ্কণ নিজে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা জানা যায় না। ব্রাহ্মণ ভূমির রাজাগণের মধ্যে উক্ত কবির প্রতিপালক রঘুনাথ রায় ১৪৯৬ শক হইতে ১৫২৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই রাজত্বের সময়েই চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে যেরূপ কবিত্ব, শব্দ-লালিত্য, রচনার পারিপাট্য ও চরিত্র অঙ্কণে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া-ছেন, তাহাতেই তিনি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া-ছেন। তিনি এই কাব্যে ভগবতীর পূজা প্রচারার্থে কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই উপাখ্যানে যে সকল পুরাণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও কবিকঙ্কণের সংস্কৃতশাস্ত্রে

পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় আছে। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বেকার বঙ্গ-দেশের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতির প্রকৃত চিত্র এই চণ্ডী-গ্রন্থে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্গসমাজের এমন প্রকৃত চিত্র তৎ-কালীন অপর কোন গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

তিনি চণ্ডী লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নানাবিধ উপাখ্যান, পশুপক্ষী নানাধর্ম্মী বহুজাতীয় মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব কেমন উৎকৃষ্ট ও মনোমুগ্ধকররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ভাড়ুদত্ত, মুরারি শীল, লহনা, ফুল্লরা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সকল চরিত্রই স্বতন্ত্রভাবে নিপুণতার সহিত সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ নয়। ইহার স্থানে স্থানে বহু দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা ব্যতীত অপভ্রংশ শব্দ ও দুই এক স্থলে অত্যুক্তি দোষ এবং অস্বাভাবিক বর্ণনাও আছে।

চণ্ডীগ্রন্থে যে দুইটী উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটী স্থান কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়নী নগরী। কলিঙ্গদেশ কবিকঙ্কণের বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী। সম্ভবতঃ তিনি সে দেশে কখন যান নাই, সেইজন্য এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক হয় নাই। দ্বিতীয় স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ অনেকটা ঠিক। অদ্যাপি মঙ্গলকোটের নিকট উজনি নামে একটী স্থান আছে, তাহাই কবিকঙ্কণের উজ্জয়িনী নগরী বলিয়া বোধ হয়। এখন উহা পতিত ভূখণ্ড মাত্র, সেখানে লোকের বসবাস নাই। উহার নিকট ভ্রমর নামে একটী খাল আছে। খালটি অজয়নদে মিশিয়াছে। ধনপতি ও শ্রীমন্ত অজয় বাহিয়া সিংহল যাত্রাকালে নদের উভয়তীরে হসনপুর, গাঙ্গড়া, বাকল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নগা, উদ্ধানপুর ইত্যাদি গ্রামের

নামোল্লেখ আছে, এখন তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর উক্ত সওদাগরদ্বয়ের নৌকা গঙ্গায় পৌঁছিলে গঙ্গার উভয়কূলবর্ত্তী যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহার অনেকগুলি এখনও প্রত্যক্ষ হইতেছে। তৎসময়ে সুন্দরবনের নিকটে অনেক স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকার ছিল, কবি ঐ সকল স্থান ফিরিঙ্গির দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"ফিরিঙ্গির দেশ খান বহে কর্ণধারে
রাত্রি দিন বহে যায় হারামদের ডরে ॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন, কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত; কিন্তু তাহা সত্য নহে। কবিকঙ্কণের বহুপূর্ব্ব হইতে কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবেণীনিবাসী মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গামাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। এই গ্রন্থখানিরও পূর্ব্বে গান হইত। তবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর মত উৎকৃষ্ট ভাবময় রচনা না হওয়ায় জনসমাজে তেমন আদৃত হয় নাই।

কাশীরাম দেব।

(কাশী) রাম ইনি কাশীরাম দাস নামেই প্রসিদ্ধ। ইঁহারই কৃপায় বাঙ্গালার মুদী হইতে লক্ষপতি ধনী পর্য্যন্ত সমানে সুলভে ব্যাসদেবের অমৃত-ময়ী লেখনীপ্রসূত পঞ্চমবেদ মহাভারত পাঠ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে।

আদিপর্ব্বের পরিসমাপ্তিতে কাশীরাম নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।—

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ নামেতে তীর্থ গঙ্গা ভাগীরথী ॥

কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস "সিঙ্গি" গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস সুত সুধাকর নাম॥
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

এই প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায়, ইন্দ্রানী প্রদেশের "সিঙ্গি" গ্রামে কাশীদাসের বাসস্থান, তথায় ভাগীরথীর দ্বাদশটী তীর্থ (ঘাট) বর্ত্তমান আছে। তিনি কায়স্থকুলোদ্ভব, তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর, পিতার নাম কমলাকান্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠের নাম গদাধর।

কিন্তু কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁহার জগৎমঙ্গল নামক গ্রন্থে যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আরও বিস্তৃত। এজন্য এস্থানে উদ্ধৃত হইল।—

ভাগীরথী তটে বাটী ইন্দ্রাইনি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্রে দৈবদৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি॥
ধ্রুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
তাহার নন্দন হৈল মীনকেতন॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।
তাহা হইতে হৈল এই তিনটী তনয়॥
বসুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
বসুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥

প্রিয়ঙ্কর, সুরেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীমুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল্যো এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু শ্রীরাম রাঘব॥
সুধাকর নন্দন এ তিন পরকাশ।
শ্রীমন্ত কমলাকান্ত দেব চণ্ডীদাস॥
দেব কমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখিয়া ওড়ো কৈল বাস॥
কমলাকান্তের হল্যো এ তিন কোঙর।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর॥
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥

বস্তুতঃ গদাধরের প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম পড়িয়া এখন নিঃসন্দেহে সিঙ্গিগ্রামে কাশীদাসের বাসস্থান নির্ণীত হইল। আদিপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে "দ্বাদশ নামেতে তীর্থ গঙ্গা ভাগিরথী"। এখনও দেখা যায় অগ্রদ্বীপের উত্তর কাটোয়া পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে পীরের ঘাট, বারদুয়ারীর ঘাট, প্রভৃতি বারটী ঘাট (তীর্থ) বর্ত্তমান আছে। আজিও ঐ সকল স্থানে দাঞহাট, আকাই হাট, পাতাই হাট, মঙ্গল হাট, পানুহাট, প্রভৃতি হাট এবং ইন্দ্রেশ্বরশিবের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়।

৺রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, কাশীরামের পুত্র তাঁহার পুরোহিতগণকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, সেই দানপত্রখানি বাং ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত। গদাধর তাঁহার জগৎমঙ্গল গ্রন্থ বাং ১০৫০ সালে সম্পূর্ণ করেন। এই

গ্রন্থে কাশীরামের মহাভারত রচনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে মহাভারত রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াই উচিত। কাশী-রামের ভ্রাতা গদাধরের কথাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। গদাধর যে জগৎ-মঙ্গলে বলিতেছেন "দ্বিতীয় শ্রীকাশীরাম ভক্তভগবান। রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারতপুরাণ॥" তিনি সেই জগৎমঙ্গলের সমাপ্তিকালে লিখিয়াছেন,

চতুঃষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে॥
নরসিংহদেব নামে উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথে ভজে নিতি॥

ইহাতে বুঝা যায়, তিনি ১৫৬৪ শকাব্দা বা সন ১০৫০ সালে রাজা নর-সিংহ দেবের শাসনকালে গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থোক্ত তাঁহার বৈরাগ্য-ভাব দেখিয়া বোধ হয় তখন তিনি প্রাচীন হইয়াছেন। যদি তখন তাঁহার ৭০ হইতে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া থাকে, তবে তাঁহার জন্মকাল শকাব্দা ১৪৭৫ হইতে ১৪৮৫ শকাব্দা বা ৯৭০ হইতে ৯৮০ সাল বলা যাইতে পারে। কাশীরাম যদি তাঁহার দশবর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার জন্মকাল ১৪৬৫ শকাব্দা হইতে ১৪৭৫ শকাব্দা অথবা সন ৯৬০ হইতে ৯৭০ সাল হইবারই খুব সম্ভব। যদি তিনি ৩০ বর্ষ বয়সে গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার গ্রন্থারম্ভ কাল ১৪৯৫ শকাব্দা হইতে ১৫০৫ শকাব্দা অথবা ১০০০ সাল হইবার কথা।

বিগত ১৩০৭ সালে দ্বিতীয় খণ্ড সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় কাশী-রামের রচিত একখানি বিরাটপর্ব্বের কথা আলোচিত হইয়াছে। সেই পুঁথিখানির শেষভাগে লেখা আছে—

চন্দ্রবাণ পঞ্চঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।

ইহার অর্থ করিতে হইলে 'অঙ্কের বামগতি' এ নিয়ম খাটে না। এখানে

দক্ষিণাগতিই ধরিতে হইল। তাহা হইলে চন্দ্র ১, বাণ ৫, পক্ষ ২, এবং ঋতু ৬, অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দায় কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব সমাধা করেন। উপরিউক্ত শকাব্দার অঙ্ক হইতে ৫১৫ বিয়োগ করিলেই বাঙ্গালা সন পাওয়া যায়। ১০১১ সাল বিরাটপর্ব্ব রচনার কাল। তিনি যদি ১০১১ সালে বিরাটপর্ব্ব শেষ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার আদিপর্ব্বের আরম্ভ-কাল ৯৫৭ সাল হওয়া বিচিত্র নহে।

কাশীরাম নিজ গ্রন্থে যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা পড়িলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে গ্রন্থ শেষে রচনার কাল নির্দ্দেশ করার রীতি ছিল। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি এই রীতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাশীরাম তাহা করেন নাই, গ্রন্থের অসমাপ্তিই ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বনপর্ব্বের শেষভাগে লিপিকর রচিত যে কয়টী পয়ার পরিদৃষ্ট হয়, তাহা পড়িলে এ অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। যথা—

ধন্য হৈল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিনপর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥ বনপর্ব্ব ৪৮৩ পৃঃ।

৫৮৪ পাদটীকায়—

"আদি সভাবন বিরাট রচিলেন পাঁচালি।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক করে ধন্নি ধন্নি।
পূর্ব্বেতেই আরম্ভিয়াছিল এই পুঁথি।
কালবশে মৃত্যু তার হৈল দৈবগতি॥

পূর্ব্ব লেখা অনুসারে চারিপর্ব্ব ভারত রচনা করিয়াই যদি কাশীদাসের মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে তাহার ৩৯ বৎসর পরে উড়িষ্যা দেশে বসিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণবিলাস নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন কি না ইহা লইয়া সমালোচক সমাজে মতদ্বৈধ আছে। একদল বলেন, কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না; তিনি কথক, যাত্রাওয়ালা প্রভৃতির নিকট শুনিয়া শুনিয়া পয়ার রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ বাদীগণ তাঁহাদের নিজবাক্য সপ্রমাণ করণার্থে কাশীরামের রচিত একটী পয়ার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করেন—

"শ্রুতিমাত্র লিখি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"

কিন্তু এই পয়ারটী ঠিক বলিয়া মনে হয় না। জীবনী লেখকগণের সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেখানির পাঠ "সূত্র মাত্র লিখি আমি রচিয়া পয়ার।" এ প্রকার পাঠবৈষম্য হইবার কারণও স্থির হইয়াছে, তাহা এই;—যাঁহারা প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন সেকালের 'সু' আর একালের মুদ্রিত 'শ্রু' একই প্রকার। এজন্য অনেকে মনে করেন, পূর্ব্বমুদ্রাকরগণ 'সু' স্থানে 'শ্রু' করিয়াই কাশীরামকে অসংস্কৃতজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাশীরাম যে সংস্কৃত জানিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে উক্ত প্রমাণস্বরূপ দুটীমাত্র স্থল উদ্ধৃত হইল—পৌষ্যপর্ব্বের পরে পৌলম পর্ব্ব হইতেই কাশীরামের গ্রন্থারম্ভ।

পৌলোম পর্ব্বের প্রথমে মূল চতুর্থ অধ্যায়। "লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে ঋষীনভ্যাগতানুপতস্থে পৌরাণিকঃ পুরাণে কৃতশ্রমঃ স কৃতাঞ্জলিস্তানুবাচ কিন্তুবন্তঃ শ্রোতুমিচ্ছন্তি কিমহংব্রুবামীতি॥"

কাশীরামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

শৌনকাদি মুণিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥

লোমহর্ষণ পুত্র সৌতি নাম ধর।
ব্যাস উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে যেইখানে॥
মুনিগণে প্রণমিলা সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন॥"

মূল মহাভারত আদিপর্ব্ব পঞ্চম অধ্যায়।

পুরাণমখিলং তাত পিতা তেঽধীতবান্ পুরা।
কচ্চিত্ত্বমপি তৎসর্ব্বমাধীষে লোমহর্ষণে॥
পুরাণেহি কথা দিব্যা আদি বংশাশ্চ ধীমতাং।
কথ্যন্তে যে পুরাস্মাভিঃ শ্রুতপূর্ব্বাঃ পিতুস্তব॥
তত্র বংশমহং পূর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ভার্গবং।
কথয়স্ব কথামেতাং কল্যাঃস্ম শ্রবণে তব॥"

কাশীরামের অনুবাদ।

সৌতির বচন শুনি কন মহামুনি।
তোর তাত সূত ছিল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী॥
নানাচিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহুশাস্ত্র করেছি শ্রবণ॥
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসিল কে কারণ।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ॥
ভৃগুবংশ উৎপত্তি হৈল কোন মতে।
বিস্তার করিয়া কহ সভার অগ্রেতে॥

এস্থলে যে দুইটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল, ইহাতেই কাশীরামের সংস্কৃতজ্ঞতা যথেষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই মহাভারতের অনুবাদক সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এ পর্য্যন্ত যে দশজন অনুবাদকের নাম পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

মহাভারতের অনুবাদক।

১ বিজয় পণ্ডিত, ২ সঞ্জয়, ৩ কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ৪ কবিচন্দ্র, ৫ কৃষ্ণানন্দ বসু, ৬ দ্বৈপায়ন দাস, ৭ রামচন্দ্র খান, ৮ গঙ্গাদাস সেন, ৯ নিত্যানন্দ ঘোষ, ১০ নন্দরাম দাস। ইহার পরে আরও ১২।১৪ জন মহাভারত লেখকের নাম পাওয়া গিয়াছে।

এই তালিকার শেষোক্ত নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরামের জামাতা এবং নন্দরাম দাস পুত্র ছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

এতগুলি মহাভারত থাকিতেও কাশীরামের মহাভারতই সমধিক আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

কাশীরামের মহাভারতে পয়ার, ত্রিপদী, তরল পয়ার ব্যতীত অপর কোন ছন্দ নাই। বোধ হয় কার্য্য শীঘ্র সমাধা করিবার জন্যই তিনি ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পয়ার, ত্রিপদীতে যে সকল কাব্য রচিত হয়, তাহা পাঁচালী প্রবন্ধ বলিয়াই পরিচিত হইত এবং তাহা গীত হইত। কাশীরাম পাঁচালী রূপ গান করাইবার জন্যই মহাভারত রচনা করেন। তাঁহার ভণিতা পাঠে অনুমিত হয়, কাশীরামের সময় এরূপ উপায় অবলম্বন ব্যতীত গ্রন্থ প্রচারের দ্বিতীয় উপায় ছিল না বলিয়া কাশীরাম লিখিয়াছেন, "পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা, অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহার সময়েও বিজ্ঞগুলী পাঁচালীর প্রতি কতকটা ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন।

কাশীরামের রচনায় বৈষ্ণব কবি কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় ছন্দদোষ, গ্রাম্যতাদোষ, কাঠিন্য, অপ্রাঞ্জলতা প্রভৃতি নাই। সুমধুর সহজ কথায় গ্রন্থের আগাগোড়া রচিত। যাহা হউক

তিনি যে সংকল্প করিয়া মহাভারত রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র রায়।

প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল লিখিয়া আপনাকে বঙ্গবাসীর নিকট চিরপরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা অশ্লীল হইলেও উঁহার রচনাবৈচিত্র এবং কবিত্বপূর্ণ শ্রুতিমধুর সরল পদবিন্যাস দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সাহিত্য ও কাব্যাদি হইতে সাধারণতঃ সাময়িক সমাজচিত্র সঙ্কলিত হইতে পারে। কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থমধ্যে যে সকল অমার্জ্জিত রুচির বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন সামাজিক বিপ্লবের পরিচায়ক। নবাবী আমলে মুসলমানদিগের অত্যাচার ও সুখ-বিলাসী ভূস্বামিগণের যথেচ্ছাচারিতা তৎকালে সমাজে একটী উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত করিয়াছিল। সেই বিলাসিতা ও লালসার মধ্যে পড়িয়া তৎকালে সকলেই প্রায় আদিরসের অনুরাগী হইয়াছিল। তাই আদিরসপ্রিয় নব-দ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরসপূর্ণ পুস্তক রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক সাময়িক রুচির বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় কবিত্ব শক্তির অসামান্য পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণাস্থ পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামের নিকট নরেন্দ্রপুরে ভারতের জন্ম হয়। কিন্তু তাঁহার জন্মের অব্দ কি সাল কিছুরই প্রকৃত বিবরণ জানা যায় না। তাঁহার প্রণীত সত্যপীরের কথা নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে এইরূপে বংশ পরিচয় লিখিত আছে—

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হত কংশ, ভুরসুটে বসতি।

নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যত
কুলের মুখটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি।
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসি।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার গুণ গায়,
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পোথী,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্টীর সহিত তাঁর, হরি হৌন বরদায়
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥

উক্ত গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্য 'সনে রুদ্র চৌগুণা' হইতে গ্রন্থ সমাপ্তি-কাল বাঙ্গালা ১১৩৪ সাল ধরা যায়। শুনা যায় তখন ভারতের বয়স পঞ্চদশ মাত্র। সুতরাং তাঁহার জন্ম সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে হইয়া থাকিবে। কবির পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তিনি স্বীয় বিষয় রক্ষার্থে নিকটবর্ত্তী গ্রাম ভবানীপুর গড়বন্দী করেন। জনরব এইরূপ পরস্পরের ভূমিসীমা সংক্রান্ত বিবাদসূত্রে কবির পিতা বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী রাণী কিঞ্চুকুমারীকে কটুবাক্য বলেন, তাহাতে রাণী রুষ্ট হইয়া দুই জন সেনানীকে ভূরসুট অধিকারের অনুমতি দেন। তাহারা একরাত্রিতে সদলে আসিয়া ভবানীপুর গড় ও পেঁড়োর গড় বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়।

ইহার পর কবির পিতার দরিদ্রতা উপস্থিত হয়। ভারত সেই গোলযোগের সময়ে মণ্ডলঘাট পরগণার নওয়াপাড়া গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাজপুর গ্রামে ব্যাকরণ

ও অভিধান পড়িতে যাইতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে উক্ত দুই গ্রন্থে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে গৃহে আসেন। পরে তাজপুরের নিকটস্থ সারদাগ্রামবাসী কেশবকুনী আচার্য্যের কন্যা বিবাহ করেন। এই বিবাহের জন্য তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণের নিকট যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং এই সংস্কৃত শিক্ষাই তাঁহার অনিষ্টের প্রধান কারণ বলিয়া প্রতিবাসীদিগের নিকটেও তিনি তিরস্কৃত হইলেন। এই সকল কারণে ভারত অভিমানবশে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক হুগলী জেলার দেবানন্দপুরনিবাসী কায়স্থ রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও মুন্সীবাবুদের যত্নে পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি মুন্সীবাবুদের নিকট যে সিধা পাইতেন তাহাতেই স্বপাকে উদরপূরণ করিতেন। এ সময় তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় অল্প অল্প পদ্য রচনা করিতেন। মুন্সীবাবুদের বাটীতে একদিন সত্যনারায়ণের পূজা হইলে, সত্যনারায়ণের কথা শুনিবার জন্য ভারতকে পুঁথি পড়িতে বলা হয়, তদনুসারে ভারত স্বরচিত ত্রিপদী ছন্দাত্মক একটী সত্যনারায়ণের কথা পড়িয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। উক্ত পূজোপলক্ষ্যে দ্বিতীয়বার কথা পাঠে আদিষ্ট হইলে ভারত চৌপদী ছন্দে অপর একখানি গ্রন্থের পাঠ শুনাইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের শেষে 'সনে রুদ্র চৌগুণা' এইরূপ সন নির্দ্দিষ্ট আছে। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া অনুমান বিংশতি বর্ষ বয়সে ভারত গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার পিতা বর্দ্ধমানরাজের নিকটে সামান্য একটি সম্পত্তি ইজারা লন। ভারতকে সংস্কৃত ও পারস্যে পারদর্শী দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে স্বকীয় সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতারা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রেরণ না করায় বর্দ্ধমানাধিপতি ঐ ইজারাটি খাস করিয়া লন। ইহাতে ভারত আপত্তি করায় রাজকর্ম্মচারী-

গণের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। কিন্তু ভারত অল্পদিন পরেই কারা-রক্ষককে বশীভূত করিয়া রাত্রিযোগে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্র অধিকারে যান। পলায়নকালে রঘুনাথ নামক জনৈক ক্ষৌরকার ভৃত্য সঙ্গে করিয়া ভারত কটক নগরীতে আসেন। এখানে মহারাষ্ট্র সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহে তিনি জগন্নাথধামে বাস করিবার অনুমতি পান। জগন্নাথে তিনি বিনা করে মঠে বাস করিবার ও জীবন ধারণের নিমিত্ত একটি বলরামী আটকে প্রাপ্ত হন। এখানে শঙ্করাচার্য্যের মঠে ভারত সম্মানের সহিত থাকিয়া রাজপ্রসাদ ও দেবপ্রসাদ ভোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা বৈষ্ণবসহ বাস, বৈষ্ণবের সহিত আলাপ, বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ ও ভাগবতশ্রবণ হেতু তাঁহার মনে বৈরাগ্য হয়। ভারত গৈরিকবস্ত্র পরিয়া উদাসীনবেশে বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্র হইতে পদব্রজে খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসেন। তথাকার গোপীনাথ জীউর মন্দির দর্শনে যাইয়া দেখি-লেন যে, কীর্ত্তনকারী গায়কসম্প্রদায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছে, তিনও সেই সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন, এবং কৃষ্ণলীলা শ্রবণে প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামে ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি ভ্রাতার বাটীতে রঘুনাথ তাহা জানিয়া গোপনে তাহাদের সংবাদ দেন। তাহা শুনিয়া তাহারা পরিবারস্থ সকলে কীর্ত্তনস্থলে আসেন ও ভারতকে বুঝাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু তিনি আর কিছুতেই পিতৃভবনে যান নাই। ভারত এক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম না হওয়া অবধি গৃহে যাইব না। কিছুদিন পরে তাঁহার শ্যালীপতি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভারতের শ্বশুরালয়ে আসেন। বিবাহবাসর ভিন্ন আর ভারতের পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বহুদিন পরে পত্নীকে দেখিয়া তিনি বড় তৃপ্তি লাভ করেন। শ্বশুরালয় হইতে যাত্রাকালে তিনি শ্বশুরকে বলিয়া যান যে, যে অবধি আমি অর্থোপার্জ্জন দ্বারা স্বতন্ত্র বাড়ী করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আপনি কোন ক্রমেই আপনার কন্যাকে আমার পিত্রালয়ে

পাঠাইবেন না। গৃহত্যাগী ভারতের এই দৃঢ়তা ভবিষ্যৎ জীবনে সফল হইয়াছিল।

শ্বশুরবাটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ফরাসডাঙ্গায় যান। এখানে ফরাসী গবর্ণমেন্টের দেওয়ান বিখ্যাত পালধিবংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর আশ্রয় লন। টাকা কর্জ্জের প্রয়োজন হইলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণের বাটীতে আসিতেন। এই সূত্রে একদিন দেওয়ানজী মহারাজের নিকট ভারতের কবিত্ব, পারসী ও সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান দরিদ্রতার পরিচয় দেন। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভারতের প্রতিপালন ভার লইতে অঙ্গীকার করেন। রাজা ভারতকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যান ও ৪০৲ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় রাজদর্শন তাঁহার কার্য্য ছিল। তিনি রাজসভায় যাইয়া মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। তাহাতে প্রীত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভারতকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। একদিন রাজা বলিলেন, ভারত তোমার কবিতায় আমার অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুমি কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডীগ্রন্থের প্রণালীক্রমে কালিকামঙ্গল রচনা কর। সেই আদেশানুযায়ী ভারত কালিকামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রত্যহ তিনি যতটুকু রচনা করিতেন, নীলমণি সমাদ্দার নামক একজন গায়ক তাহা গীতের সুরে রাজাকে গীত গাহিয়া শুনাইত। রচনা শেষ হইবার পূর্ব্বে রাজা উক্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যাসুন্দর সংযোজনা করিতে অনুমতি করেন। তদনুসারে তিনি সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহার প্রতিভা ও কবিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে আপন প্রিয় সভাসদরূপে গ্রহণ করেন। উক্ত কালিকামঙ্গলের শেষে গ্রন্থসমাপ্তিকাল এইরূপ লিখিত আছে—

'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা'॥

ইহার অর্থ ১৬৭৪ শকে ভারত কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া কালিকা-মঙ্গল শেষ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৪০ বৎসর বয়সের কিছু পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণনগরাধিপের আশ্রয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্বীকার করা যায়।

একদিন রাজা ভারতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অনেকদিন এখানে রহিয়াছ, তোমাকে তোমার স্ত্রীপুত্রের কোন তত্ত্ব লইতে দেখিনা ত, ইহার কারণ কি ?" তদুত্তরে ভারত বলিয়াছিলেন, আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে আছে, ভ্রাতাদের সহিত মনান্তর হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, নিজে স্বতন্ত্র বাটি করিতে না পারিলে সংসারী হইব না, সুতরাং কেমন করিয়া আর বাটীতে মুখ দেখাই। গঙ্গাতীরে একটু জমি পাইলে বাড়ী ঘর করিয়া সংসারী হইতে পারি। নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিল; তিনি ভারতকে মুলাজোড় গ্রামখানি ৬০০ শত টাকা রাজস্বে ইজারা দেন এবং বাটীর জন্য ১০০০ টাকা দান করেন।

ভারত রাজপ্রদত্ত মূলাজোড় গ্রামে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বর্দ্ধমানপতি তিলকচন্দ্রের মাতা বর্গীর ভয়ে মূলাজোড়ের পার্শ্বস্থ কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পাছে রাণীর হস্তী অশ্ব গো প্রভৃতি পশুগণ ব্রাহ্মণ ভারতের ইজারাভুক্ত স্থানে যাইয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করে এবং তিনি ব্রহ্মস্বহরণ পাপে পতিত হন, এই ভয়ে তিনি আপন কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে পত্তনি লইয়াছিলেন, ইহার পরিবর্ত্তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতকে মূলাজোড়ে ১৬ বিঘা ও আনরপুরের অন্তর্গত গুস্তে গ্রামে ১০৫ বিঘা ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তররূপে দান করেন। উক্ত গ্রাম-বাসীর অনুরোধে তিনি মূলাজোড় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারেন নাই। পত্তনিদার রামদেবের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া ভারত কৃষ্ণচন্দ্রকে একখানি পত্রসহ "অষ্টশ্লোকী নাগাষ্টক" লিখিয়া পাঠান। কৃষ্ণচন্দ্র নাগাষ্টকের রচনা কৌশলে প্রীত হইয়া নাগের অত্যাচার নিবৃত্ত করেন। কয়েক

বৎসর সুখে সচ্ছন্দে বাস করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খৃঃ (পলাশী-যুদ্ধের তিন বৎসর পরে) মহাকবি ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

রায়গুণাকরের "অন্নদামঙ্গল" তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই অন্নদামঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত ; প্রথমভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, দ্বিতীয়ভাগে বিদ্যাসুন্দর পালা ও তৃতীয়ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহরবিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল ভিন্ন তিনি 'রসমঞ্জরী' অসম্পূর্ণ 'চণ্ডী নাটক'ও বহুসংখ্যক হিন্দী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৭৩২ শকে ২৫ ফাল্গুন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাঁচড়াপাড়া গ্রামে কবি ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ ও মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। তাঁহার পিতা কাঁচড়াপাড়াব নিকটবর্ত্তী শিয়ালডাঙ্গার নীলকুটীতে চাকুরী করিতেন।

শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র বড় দুরন্ত ছিলেন। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। কিন্তু এই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা লিখিবাব সখ হয়। তখন গ্রামের অন্যান্য বালকেরা পার্শী পড়িত, ঈশ্বর তাহাদের মুখে ঐ পার্শী কবিতার অর্থ শুনিয়া নিজেই আবার বাঙ্গালায় কবিতা বাঁধিতেন। বালককালে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতপুত্র মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সর্ব্বদাই

কবিতার লড়াই হইত। সত্যই মহেশ একজন সুকবি ছিলেন। ঈশ্বর একদিন ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে বলেন, "দাদা লেজ লুকালে কেন"? মহেশ তখনই উত্তর দিলেন—

"ওরে দুষ্ট ভায়ের দুই থাকলে লেজ
থাকত না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে
সোণার লঙ্কা ছারখার॥"

তদবধি ঈশ্বর মহেশকে বড় ভক্তি করিতে লাগিলেন। মহেশ এক সময় প্রতিজ্ঞা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র জীবিত থাকিতে তিনি কলম ধরিবেন না; বস্তুতঃ মহেশ এই বাক্য পালন করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে "মহেশ পাগলা" বলিত।

ঈশ্বরচন্দ্রের দশ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, জননীর মৃত্যু-জনিত শোকের লাঘব না হইতেই তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হন। শুনা যায় তাঁহার পিতা বিবাহ করিয়াই কর্ম্মস্থানে যান. নববধূ গৃহে আসিলে হরিনারায়ণের মাতা বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিতে যান। ঈশ্বরের তখন মহারাগ, আর এক জনকে মা বলিতে হইবে, এ বড়ই কষ্টকর। তিনি বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া একটী রুল ছুড়িলেন, কিন্তু তাহা বধূর গায়ে লাগে নাই; তাঁহার জেঠা মহাশয় তাহাকে বিলক্ষণ দুই এক ঘা জুতা মারিলেন। পরে তাঁহার মাতা-মহ আসিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বলেন "ঈশ্বর তোদের মা নাই, মা হইল বেশ হইল; তোদের যত্ন আয়ত্তি করিবে।" এই কথা কয়টি তাঁহার অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিল। একে তিনি বরাবর নকলের প্রতি চটা, তাহাতে আজ নিজের মাকে ভুলিয়া নকলকে মা বলিতে হইবে এ তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তাহার কিছু পরেই কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন। এখানে থাকিয়া ইংরাজী শিখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু লেখাপড়ায়

অমনোযোগের জন্য তাঁহার বড় কিছু হইল না। তিনি জন্ম কবি, পাঠ্যাবস্থায় কেবল কবিতার চর্চ্চা করিতেন। কবিতাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও শ্রুতিশক্তি বড় আশ্চর্য্যজনক শুনা যায়। তাঁহার ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থের সহিত মুখস্থ করিয়াছিলেন।

১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, পত্নী দেখিতে কুরূপা ও হাবাবোবার মত ছিল, এজন্য বিবাহের পর হইতে তিনি স্ত্রীর সহিত কখনও বাক্যালাপ করেন নাই। ১২৮৭ সালের ১২ মাঘ তাঁহাব বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে ঈশ্বর "সংবাদ প্রভাকর" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। মধ্যে ১২৫৯ সালে যোগেন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় "সংবাদ প্রভাকর" উঠিয়া যায়। ঐ বৎসর স্বভাবকবি ঈশ্বরের রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ মল্লিক "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করেন, ঈশ্বর ঐ পত্রিকায় বিশেষ সাহায্য করিতেন। কিছু দিন পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শনমানসে কটকে যান এবং এইখানে জনৈক দণ্ডীর কাছে তিনি তন্ত্রাদি শিক্ষা করেন। ১২৪২ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই বর্ষের প্রারম্ভেই তিনি কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে পুনরায় 'প্রভাকর' প্রকাশ করেন। ১২৪৫ সালের আষাঢ় হইতে প্রভাকর প্রাত্যহিক রূপে প্রকাশ হইতে থাকে। দেশীয় দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। এই সময় পণ্ডিতগণ এবং সহর ও মফঃস্বলের জমীদারগণ নানা মতে ঈশ্বরের সাহায্য করেন। ১২৫৩ সালের ৭ আষাঢ় তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় ভাস্করসম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "রসরাজ" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরও তাঁহার প্রতিবাদ করেন। কিছুদিন পরে উভয়

পত্রই উঠিয়া যায়। ১২৫৪ সালে ভাদ্র মাসে ঈশ্বর "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রগণের কবিতা ও প্রবন্ধাদি ছাপা হইত। ১২৫০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তিনি একখানি করিয়া বৃহৎ কলেবর প্রভাকর প্রকাশ করেন। এই খানি প্রতিমাসের ১লা প্রকাশিত হইত। ইহা কেবল তাঁহাব নিজের কবিতায় পূর্ণ থাকিত। ইহার জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে তিনি কোন বাগানে অতিবাহিত করিতেন। শারদীয়া পূজার পর প্রায়ই জলপথে বাহির হইতেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ প্রভৃতি দেখিয়া তাহার কবিতা রচনা করেন, এতদ্ভিন্ন আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দশবর্ষকাল নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি সেন, নিধুবাবু, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত, রাসু ও নৃসিংহ প্রভৃতি অনেকগুলি বিখ্যাত বাঙ্গালী কবির জীবন চরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। তাহার পর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তাঁহার অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া ১২৬২ সালে ১ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশ করেন। প্রাচীন বাঙ্গালা কবির জীবনবৃত্তান্তাদি উদ্ধার পক্ষে ঈশ্বরই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখ প্রভাকরে 'প্রবোধ প্রভাকর' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, ঐ গ্রন্থ ১লা ভাদ্রে শেষ হয়। তাহার পর প্রতি মাসের মাসিক প্রভাকরে 'হিতপ্রভাকর' ও 'বোধেন্দুবিকাশ' ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া সমাপ্ত করেন। তৎপরবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন। ১২৬৫ সালের ১০

মাঘ রাত্রি দুই প্রহরের সময় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন ও তাঁহার স্বর বড় মিষ্ট ছিল। তাঁহার মুখ সদাই হাসিমাখা, সংসারে থাকিয়াও সংসারবৈরাগী; তিনি স্বদেশীয়কে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার কবিতা পাঠে জানা যায়—

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

হাস্যরসকবিতা রচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; উক্ত কবিতা লিখিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তিনি এখনকার মত, তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা ও নীতিসভার সভা ছিলেন। ঐ সকল সভায় বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন। আবার তখনকার কলিকাতার নিকটস্থ সখের কবি ও হাফ্ আখড়াই দলের সঙ্গীত-সংগ্রামের সময় কোন না কোন পক্ষে থাকিয়া তিনি গীত রচনা করিয়া দিতেন। তিনি যে পক্ষে থাকিতেন সেই দলেরই জয় হইত। তখনকার রুচি এখনকার মত ছিলনা; সে সময়ে সকলেই অশ্লীলতাপ্রিয় ছিল, এই নিমিত্ত ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতার ভাগ অধিক। তাহা বলিয়া তাঁহার মন অশ্লীল ছিল না। তাঁহাকে একজন সাধুপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অনেক সময় অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন,কিন্তু সে সমস্তই সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেন। শুনা যায় তাঁহার বাড়ীতে সমস্ত দিন উনান জ্বলিত, যে আসিত সেই তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে পাইত। ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না, সহর ও মফঃস্বলের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ঈশ্বরকে ভালবাসিত, মহাসম্ভ্রান্ত

জমীদার অবধি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সামান্য সতরঞ্চে বসিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তুষ্ট হইয়া আসিতেন।

মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা "প্রভাকরের" সম্পাদক হন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র। এই সময়ে সেই মহেশ দুঃখ করিয়া লেখেন—

"সাত মেড়াতে হয়ে জড়ো নষ্ট কর্‌লে প্রভাকর
জন্মে কলম ধরেনিকো রাম হ'ল এডিটর॥
আগা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাণ্ডর॥"

রাধাকান্ত দেব।

১৭৮৪ খ্রীঃ ১লা চৈত্র কলিকাতার সিমূলিয়ায় স্বীয় মাতুলালয়ে রাধাকান্তদেবের জন্ম হয়। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত সভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র এবং তাঁহার পোষ্যপুত্র গোপীমোহন দেবের পুত্র। ১৭৯৭ খৃঃ মহারাজ নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত গোপীমোহনের বিষয় বিভাগ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারে ঐ গোলযোগ মিটিয়া গিয়া উভয়ের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ হইয়া যায় এবং গোপীমোহন পুরাতন রাজবাটী প্রাপ্ত হন।

শৈশব হইতেই রাধাকান্তের লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগ ছিল। তাঁহাকে পড়ার জন্য কখনও কাহাকে শাসন করিতে অথবা বলিতে কহিতে হয় নাই। তিনি স্বীয় যত্ন ও অধ্যবসায় বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষায় পারদর্শী হন। রিকার্ডের ভারতীয় বিবরণীতে তাঁহার মানসিক উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। রাজা নবকৃষ্ণ অতি অল্প বয়সে পৌত্র রাধাকান্তের

বিবাহ দেন। প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতিবংশীয় গোপীকান্ত সিংহের কন্যার সহিত এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। রাজা নবকৃষ্ণ এই বিবাহে প্রচুর অর্থব্যয় ও মহাসমারোহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ জন্য রাধাকান্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন সমাজের ১৪শ গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। রাধাকান্ত পিতৃপিতামহের ন্যায় রাজভক্ত ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সাধনার্থে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই সমধিক যত্নবান ছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ তিনি সার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের সহিত একত্র মিলিত হইয়া হিন্দু কালেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রতী হন এবং উইলসনের সাহায্যে উক্ত কালেজের উন্নতির জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করেন। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া গবর্মেণ্টনির্ব্বাচিত পরিদর্শকরূপে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশীয় হিন্দুগণ এখানকার অনুমোদিত ও মুদ্রিত পাঠ্য পুস্তক সকল বিদ্যালয়ে ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে এইরূপ সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, ঐ সভার সম্পাদিত পুস্তকে হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ বিষয় সমূহ লিখিত থাকিবে। সাধারণের এই মিথ্যা বিশ্বাস অপনোদনের জন্য রাজা রাধাকান্ত ঐ সভার সহকারী সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া উক্ত সভার উন্নতি বিধানার্থে অনেক যত্ন করেন, এবং ঐ সময়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অভিপ্রায়ে "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক" নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮২০ খৃঃ তিনি সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী অনুকরণে বানানবহি ও বাঙ্গালা ভাষায় নীতিকথা প্রচলন করেন। এইরূপ গ্রন্থ প্রচারের জন্য গ্রেটবৃটেন ও আয়ার্লণ্ডের এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে অনেক প্রশংসা করিয়া পাঠান। তিনি অনেক সময়ে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই জন্য বেথুন সাহেব তাঁহাকে "স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা" বলিয়া স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি গ্রেটবৃটেন আয়র্ল ও সভার সদস্য, ফিলজিক, বার্লিন, কোপেন হেগেন, সেণ্টপিটার্স বার্গ, বোষ্টন, ভিয়েনা এই সকল দেশের সভার সভ্য হন।

প্রধানতঃ "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলিত করিয়াই রাধাকান্ত সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন। এই সংস্কৃত অভিধান হইতে কেবল তাঁহার নহে, পাণ্ডিতপ্রধান সমগ্র বঙ্গদেশেরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি ১৮২২ খৃঃ উহার প্রথমভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাহার পরে ১৮৫৮ খৃঃ উহার শেষভাগ মুদ্রিত হয়। এই শেষভাগ গ্রন্থ প্রণয়নে রাধাকান্ত দেব প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহাতে পৌরাণিক হিন্দুগণের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্ম প্রণালী, প্রাচীন উপাখ্যান, ব্রতকর্ম্ম এবং গণিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র, দর্শন, বেদান্ত, প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাধাকান্ত ঐ সুবৃহৎ গ্রন্থ ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিত এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ সমুদয় পণ্ডিতবর্গকে উপহার দিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে যে কেহ তাঁহার নিকট উক্ত গ্রন্থ চাহিয়াছেন, তিনিই পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রত্যেক সাহিত্য সভাতেই ঐ অভিধান এক একখানি দান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক শিক্ষিত সভাই তাঁহাকে অনরারি করেস্‌পনডিং মেম্বাররূপে গ্রহণ করেন এবং রুষের রাজা জার,ও ডেনমার্কের রাজা ৭ম এডওয়ার্ড ফ্রেডারিক তাঁহাকে সম্মানসূচক একখানি পদক সমেত স্বর্ণহার প্রেরণ করেন। ঐ চেনের প্রত্যেক আঁকড়ীতে ই, ভি, আই অঙ্কিত ছিল। ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টারের দ্বারায় তাঁহারা ঐ হার রাধাকান্ত দেবকে প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক ও বহুকার্য্যে যোগদান করিয়া দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের সমধিক শ্রদ্ধা:

ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃঃ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা স্থাপিত হইলে রাজা রাধাকান্ত দেব ঐ সভার সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পদে তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৩৭ খৃঃ তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ভারত গবর্মেণ্টের নিকট হইতে তিনি রাজাবাহাদুর উপাধি ও খেলাৎ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৮ খৃঃ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান সমাপ্ত হইলে তিনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে ঐ পুস্তক উপহার প্রেরণ করেন। ভিক্টোরিয়া ঐ উপহারে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন এবং তাঁহাকে একখানি পদক পাঠাইয়া দেন। ঐ পদকের এক পৃষ্ঠে ভারতেশ্বরীর উত্তমাঙ্গ ও অপর পৃষ্ঠে ভারতেশ্বরীর নাম এবং রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর খোদিত ছিল। তাহা ভিন্ন ঐ পদকের সহিত ভিক্টোরিয়ার আদেশানুসারে ভারতসচীব সর চার্লস্ উড্ তাঁহাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। শব্দকল্পদ্রুম হইতে তিনি শিক্ষিত সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিতগণেরও কৃতিত্বের পরিচয় আছে এবং তাঁহার নিজের পাণ্ডিত্যও অনেক ছিল। তিনি একজন সুকবি ছিলেন, তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের প্রতিচ্ছায়া তাঁহার স্বরচিত কবিতাসমূহে সম্যক প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ কবিতাগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া "রাধাকান্ত পদাবলী" নামে কয়েক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। তিনি জীবনের শেষ সময় গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন। ঐ কবিতাগুলি তিনি বৃন্দাবনবাস কালেই রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে ছাঁদের হরফে স্বীয় গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎ দিবস "রাজার হরফ" বলিয়া প্রচলিত ছিল, কারণ ঐ সময়ে ঐরূপ ছাঁদের অক্ষরে আর কাহারও গ্রন্থাদি মুদ্রিত হয় নাই।

রাজা রাধাকান্ত দেব কায়স্থকুলীনগণকে একজয়ী করিয়া স্বীয় সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এতদর্থে তাঁহার বহু অর্থব্যয় হয়।

১৮৬৪ খৃঃ ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন। এইস্থানে বাসকালীন ১৩ নবেম্বর ১৮৬৬ খৃঃ ভারত প্রতিনিধির দ্বারা আগ্রাতে একটী মহতী দরবার আহুত হয়। রাজাদেশে রাজা রাধাকান্তকে সেই সভায় আমন্ত্রণ করিয়া ভারত প্রতিনিধি তাঁহাকে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রদান করেন ও ২১ পার্থাসের খিলাৎ এবং হস্তী ও অশ্ব দান করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ ১৯ এপ্রিল রাজা রাধাকান্ত দেব বৃন্দাবনধামে আপন কুঞ্জবাটীকার মধ্যস্থিত তুলসীকুঞ্জের মৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়া, মালা জপিতে জপিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। শুনা যায়, তিনি নাকি স্বীয় আত্মীয়বন্ধু ও ভৃত্যগণকে কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে দ্বিতল হইতে নীচে নামিয়া আসেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে, তাঁহার স্বদেশের ও বিদেশের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই যথেষ্ট শোক প্রকাশ করেন, এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ১৮৬৭ খৃঃ ১৪ মে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন হলে একটী বৃহৎ সভা করেন ; ঐ সভায় যে চাঁদা উদ্ধৃত হয়, তাহা দ্বারা তাঁহার একটা আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ও তৈলচিত্র নির্ম্মিত হয়। ঐ প্রতিমূর্ত্তি টাউনহলে রক্ষিত হইয়াছে এবং তৈলচিত্রখানি বৃটিশ ইণ্ডিয়াম সভা-গৃহে স্থাপিত আছে অবশিষ্ট অর্থে গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কালেজের বি, এ পরীক্ষার পূর্ব্বে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রকে একটী স্বর্ণ-পদক দিবার নিয়ম করেন।

দীনবন্ধু মিত্র।

১২৩৬ সালে চৈত্র মাসে মাতামহ ভবনে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী বেলেড়ী-

গ্রামে। তাঁহার পিতা কালাচাঁদ মিত্র কাঁচড়াপাড়ার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়ীয়া-গ্রামে মাতামহভবনে প্রতিপালিত হইয়া তথায় বাস করেন। দীনবন্ধুর পিতা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম "গন্ধর্ব্বনারায়ণ।" লোকে তাঁহাকে "গন্ধ" বলিয়া ডাকিত। দীনবন্ধুর চরিত্রে যে সকল মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত, তাহার অধিকাংশই তিনি স্বীয় জননীর নিকট পাইয়াছিলেন।

বাল্যে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন, এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অতি সামান্য বেতনে জমিদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর চাকুরীতে মন টিকিল না। তিনি পিতার অবাধ্য হইয়া চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন, এবং বাহির সিমুলিয়ায় পিতৃব্যভবনে খুল্লতাত ভ্রাতাদিগের আশ্রয়ে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে তাঁহাকে পালাক্রমে রাঁধিতেও হইত।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে মহাত্মা লঙ্গসাহেবের অবৈতনিক ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। লঙ্গ সাহেব দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি পিতৃদত্ত "গন্ধর্ব্বনারায়ণ" নাম পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। সেই হইতে তিনি দীনবন্ধু নামে পরিচিত। উক্ত স্কুল হইতে তিনি হেয়ার স্কুলে পরে জুনিয়ার স্কলারশিপ্ বৃত্তি পাইয়া হিন্দুকলেজে পড়িয়া সিনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন। প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীনবন্ধুর কবিতার গুরু। দীনবন্ধুর কবিতার অধিকাংশই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার অনুকরণে রচিত।

কলেজ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হুগলীজেলাস্থ বাঁশবেড়ে গ্রামে দীনবন্ধুর বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রীর আদর্শচরিত্রগুণে কখনও তাঁহাকে সাংসারিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। তাঁহার আইন শিক্ষার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি

পরীক্ষার পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পোষ্ট আফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোষ্টমাষ্টার হইলেন। এই কার্য্যকালেও তিনি সাহিত্যচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। পাটনায় তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া সাহেবগণ এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। ঐ সময় তিনি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ লুসাই যুদ্ধে ডাকের বন্দোবস্তের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক মনোনীত হইলে তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধমুখে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তিনি "কমলেকামিনী" প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৭০ খৃঃ মে মাসে কলিকাতায় পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের প্রধান সহকারীপদে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় থাকিয়াও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে যাইতে হইত। লুসাই যুদ্ধ হইতে আসিলে তিনি ১৮৭১ খৃঃ মে মাসে রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি বহুমূত্র রোগে অনেক কষ্ট পাইয়া ১৮৭৩ খৃঃ আটটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে দীনবন্ধুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। তিনি সে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে কটকে ছিলেন বলিয়া মাতার সেবা করিতে পান নাই; এ দুঃখ তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। তজ্জন্য দীনবন্ধু আক্ষেপ করিয়া "দ্বাদশ কবিতায়" প্রবাসীর বিলাপে লিখিয়াছিলেন—

"ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই॥"

দীনবন্ধু যেখানে যাইতেন সেইখানেই তাঁহার বন্ধু জুটিত বলিয়া সকল স্থানেই তাঁহার বন্ধু ছিল। সকলেই তাঁহাকে নিতান্ত সুহৃদ্ জ্ঞানে অত্যধিক বিশ্বাস করিত ও প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাহার মধ্যে বঙ্কিম বাবুর সহিত বন্ধুত্বই তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ঘটনা। সেই

ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" বঙ্কিম বাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে "মৃণালিনী" উপহার দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসা ইহকাল লইয়াই নহে, তাই দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ দেখাইবার জন্যই আনন্দমঠের নূতন রকম উৎসর্গপত্র লিখিত হইয়াছে, ও বন্ধুর উদ্দেশেই বঙ্কিমচন্দ্র "ত্বনুমাংত্বদধীন জীবিতং" প্রভৃতি কুমারসম্ভবের শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত "সাধুরঞ্জন" পত্রিকায় দীনবন্ধু সর্ব্বপ্রথম মানব-চরিত্র নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তাহার পরে সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশকবিতা, জামাইষষ্ঠী দুইবার এবং প্রভাকরে বিজয়কামিনী নামে এক ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। ভ্রমণকালে নীলকরগণের দৌরাত্ম্য বিশেষভাবে অবগত হইয়া তিনি নীলদর্পণ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার নাম ছিলনা; লঙ্গসাহেব কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদিত হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় অন্যান্য বহুভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থদ্বারা দীনবন্ধু বঙ্গের প্রজাসাধারণের বহুল উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। "নবীন তপস্বিনীর" পর যথা-ক্রমে "বিয়েপাগলা বুড়ো" "সধবার একাদশী" ও "লীলাবতী" প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি বাঙ্গালায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত বিষয়ে জানা যায় যে দীনবন্ধুর অনেক গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। নীলদর্পণের প্রায় ঘটনা সত্য, নবীন তপস্বিনীর বড় ও ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত, সধবার একাদশী, জামাইবারিক, বিয়ে-পাগলা বুড়ো, এ সকলই সত্য ঘটনামূলক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "বিস্ময়ের বিষয় বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা সর্ব্বশ্রেণীর, বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই।"

দীনবন্ধু অনেক সময়ই চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র গড়িতেন। দীনবন্ধুর এই দুইটী গুণ (১) তাঁহার সমাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব ঘটিলেই তাঁহার কবিতা তত হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। তাঁহার প্রধান নায়কনায়িকাগণের মধ্যে চরিত্রের অসুন্দরতার ইহাই কারণ। একবার দেখামাত্র দীনবন্ধু তাহা যেমন চিত্রকরের তুলিতে আঁকিয়াছেন এবং তাহাতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিবহির্ভূত বিষয় কল্পনাবলে আঁকিতে গিয়া সেরূপ কৃতকার্য্য হন নাই।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খৃঃ ২৫ জানুয়ারী শনিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষী নদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তাঁহার মাতা জাহ্নবী দাসী যশোহরের কাঁটিপাড়ার জমীদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা ছিলেন। মধুর পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থান খুলনা জেলার অন্তর্গত তালাগ্রামে ছিল। তাঁহার পিতামহ রামনিধি দত্ত উক্ত তালাগ্রাম ত্যাগ করিয়া সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া বাস করেন।

মধুর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতগণ সকলেই উপার্জ্জনশীল ছিলেন। জাতীয়ধর্ম্মে নিষ্ঠা, দানশীলতা, আতিথ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহাদের সাগরদাঁড়ীস্থ দত্তপরিবার স্বদেশীয় সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই দত্তবংশের মিতব্যয়িতা ও ইন্দ্রিয়সংযম বিষয়ে লক্ষ্য

ছিল না। রাজনারায়ণ প্রথমা পত্নীর বর্ত্তমানেই আর তিনটী বিবাহ করেন। মধুর জন্মের সময় দত্তবংশের বিশেষ সৌভাগ্যের কাল; সুতরাং তাঁহার জাতকর্ম্মাদি অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের পুত্র ও পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতামাতা, পিতৃব্য ও আত্মীয়স্বজনগণের একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। যেরূপ আদরে এবং প্রশ্রয়ে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, কোটীশ্বরের সন্তানগণেরও বোধ হয় সেরূপ হয় না। তাঁহার বাল্যের সেই ভোগসুখ ও আদরের কথা শুনিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অমিতব্যয়িতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

মধুর সাত বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা খিদিরপুরে বাটী ক্রয় করিয়া বাস করেন। ঐ সময়ে মধু গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েন এবং তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া দিনকয়েক খিদিরপুরের একটি ইংরেজী স্কুলে পড়িয়া ১৮৩৭ খৃঃ হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। স্বীয় অধ্যবসায় গুণে মধু কলেজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। ১৮৪১ খৃঃ তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিয়া জুনিয়ারবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পান। প্রথমতঃ তিনি গণিতশাস্ত্রদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ৺ভূদেব প্রমুখ ছাত্রগণ সেক্ষপীয়ার অপেক্ষা নিউটনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেন, কিন্তু মধু সেক্ষপীয়ারের পক্ষসমর্থন করিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন যে, সেক্ষপীয়ার চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন সেক্ষপীয়ার হইতে পারিতেন না। এই কথার পর তিনি গোপনে গণিতশাস্ত্র অভ্যাস করিয়া অল্পদিনেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। একদিন শিক্ষক রিজ সাহেব বোর্ডে একটি কঠিন অঙ্ক কসিতে দিলেন। তাঁহার সহপাঠীগণ কেহই সে অঙ্ক কসিতে পারিল না, তখন মধু নির্ভুল ও সুন্দর প্রণালীতে অঙ্ক কসিয়া ভূদেব বাবুর গা টিপিয়া বলিয়াছিলেন, "কেমন

সেক্ষপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন, তাহা দেখিলে ত ? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্য্যন্ত শেষ।"

সতের বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠের সময় হইতেই মধু প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ কালে কাপ্তেন রিচার্ডসন্ বিদায় লইলে কার সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি কোন কারণে মধুকে তিরস্কার করিলে মধু অভিমানে কলেজ ত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। শৈশব হইতেই মধু অতি অমায়িক ছিলেন। ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্ব কখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি কখনও নীচবংশীয় বালকদিগের কি দাসদাসীর প্রতিও উপেক্ষা দেখান নাই এবং শৈশব হইতেই পরোপকারে মুক্তহস্ত ছিলেন ও ঐ সময় হইতেই পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। অন্যান্য বালকের ন্যায় তাঁহাকে কখনও গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত খাইয়া পাঠে মনোযোগী হইতে হয় নাই। পাঠশালায় কি কলেজে সহপাঠীদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই সহ্য হইত না। এই উচ্চাভিলাষ চিরদিনই তাঁহার চরিত্রে দেখা যাইত। তাঁহার কোন সহপাঠী তাঁহার তৎকালের শিক্ষা বিষয়ে বলিয়াছিলেন, "যত্ন ও পরিশ্রম গুণে আমিও কলেজের মধ্যে একজন ভাল ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু মধু আমাদিগের ভিতর ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিল" এবং আর একজন লিখিয়াছিলেন "বয়সে মধু আমা অপেক্ষা ছোট ছিল, কিন্তু এমনই তার বিদ্যাবুদ্ধির জোর, যে আমাদিগের অনেক পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া লম্ফে লম্ফে নিম্নশ্রেণী সকল অতিক্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমাদিগের সহাধ্যায়ী হইয়াছিল।" তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ তাঁহার জননীপ্রদত্ত উৎসাহবাক্যে আরও বর্দ্ধিত হইত। মধুর জননী ধর্ম্মশীলা, বিদ্যানুরাগিনী, সাধ্বী ও পুত্রবৎসলা রমণী ছিলেন। সপত্নিদিগকে তিনি সহোদরাধিক ভাল-

বাসিতেন। বিবাহের পরে তিনি লেখাপড়া শিখিয়া পুরাণ গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করেন। মধুও বাল্য হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন। মধু জননীর অনেক সদ্‌গুণ পাইয়াছিলেন। জাহ্নবী পুত্রকে একদণ্ড না দেখিলে অস্থির হইতেন এবং মধু সহস্র অন্যায় করিলেও তাঁহারা কিছুই বলিতেন না। বস্তুতঃ জননী পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। মধুও যখন যাহাকে ভালবাসিতেন, প্রাণ মন ঢালিয়া ভালবাসিতেন। এ ভালবাসা তিনি মাতৃপ্রকৃতি হইতেই পাইয়াছিলেন। মধু ভাল বাসিয়া পরকে আপন করিতে পারিতেন, কিন্তু আপনাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিতে জানিতেন না। নিজের ইচ্ছা পরের ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিবার শিক্ষা তাঁহার হয় নাই।

ছাত্রাবস্থায় বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও পানদোষ মধুর চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। ডিরোজীওর ছাত্রগণমধ্যে মদ্যপান ও অখাদ্য ভক্ষণ তৎকালে একটী সভ্যতার মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার্থে বহু যত্ন ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন; কিন্তু পুত্রকে ধার্ম্মিক ও নীতিজ্ঞ করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা দিতে পারেন নাই; মধুর অন্যায় কার্য্যে শাসনের পরিবর্ত্তে প্রশ্রয় দিতেন। সুতরাং বাল্য হইতে অত্যাদরে পালিত মধুর পক্ষে যৌবনের উদ্দামভাব সংযত করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। প্রেমপিপাসু হৃদয় লইয়া তিনি কবি বায়রণকে আপনার আদর্শ করিতে যাইয়া সুনীতি ও মিতাচারের প্রতি অবজ্ঞা করিতে শিখিলেন। ক্রমেই তিনি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এই কারণে তিনি নিজেও আজীবন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইয়া শেষে দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রকেও তদনুরূপ অসুখী করিয়াছিলেন।

রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজীওর ছাত্রগণ যেরূপ রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ সংস্কারক হন, তদ্রূপ প্যারীচরণ, ভূদেব, রাজনারায়ণ বসু মধু

প্রভৃতি রিচার্ডের ছাত্রগণ সুলেখক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। মধু রিচার্ডকে এত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন যে তাঁহার দোষগুলিও অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা কলেজের প্রধান শিক্ষক জোন্স সাহেব তাঁহাকে রিচার্ডের বাঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মধু, তুমি কি মনে কর, কাপ্তেন সাহেবের ন্যায় বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা হইলে তুমি একজন বড়লোক হইবে?" মধু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। এই সঙ্গীতপ্রিয়তা ও কাব্যানুরক্তি কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। তাঁহার পিতা পিতৃব্যের ন্যায় তিনিও আগমনী, বিজয়া, সখীসম্বাদ প্রভৃতি সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে গলদশ্রু হইতেন। খৃষ্টান হইবার পর অতি অল্পদিনই মধু সাগরদাঁড়ীতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশের সেই ঘনশ্যামলতৃণাচ্ছাদিত তুঙ্গস্রোতা কপোতাক্ষীনদীর সুকোমল মনোহারিণী মূর্ত্তি চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। মধু অনেক বিষয়ে চপল এবং অস্থির থাকিলেও সাহিত্য বিষয়ে কখনও তাঁহার মতিভ্রম হয় নাই। সাহিত্যের সেবা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব, এ আশা তাঁহার হৃদয়ে ধ্রুবতারার ন্যায় চিরদিন নিশ্চল ছিল। নিন্দা, উপেক্ষা, দরিদ্রতা কিছুতেই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। কলেজের অতি নিম্ন শ্রেণী হইতেই তিনি ইংরাজীতে গদ্য ও পদ্য রচনা করিতেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে মধু কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতালেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। পাঠ্যাবস্থায় মধু বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন নাই। সে সময়ে উহা অশিক্ষিত বর্ব্বরের ভাষা মনে করিয়া তিনি মাতৃভাষা ভুলিতে চেষ্টা করেন, এবং ইংরাজীতে গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইবেন, তাঁহার মনে এই উচ্চাশা স্থান পাইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তিনি বলিতেন, "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" বাল্যাবধি এই কুসংস্কার বশতঃ তিনি প্রথম জীবনে

ইংরাজী ভাষারই সেবা করিয়াছেন। প্রাপ্তবয়সে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা করেন। হিন্দু কলেজ হইতে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা শেষ হয়। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে নিজের ভাষা প্রকাশের প্রণালীর পথ নিজে আবিষ্কার করেন। দরিদ্র কাশীদাস ও কৃত্তিবাসই তাঁহার ভাষা শিক্ষার আদিগুরু। মধু জুনিয়ার বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ-কালে, রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুই খানি স্বর্ণপদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই পরীক্ষায় মধু প্রথম হওয়ায় স্বর্ণপদক তিনিই প্রাপ্ত হন।

রিচার্ডসনের যত্নে মধুর বাল্যরচিত অনেক কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার মনে বাল্য হইতেই এই দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে একদিন জগৎকে কবিত্বের গৌরবে তিনি চমৎকৃত করিবেন। ১৮ বৎসর বয়সেই তিনি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ইংরাজী পত্রিকায় কবিতা প্রেরণ করিতেন। হিন্দু কলেজে পাঠকালে মধু উচ্ছৃঙ্খল, অসংযতেন্দ্রিয়, অমিতব্যয়ী, বিলাসী ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন থাকিলেও অধ্যয়ন-শীলতা, কাব্যানুরাগ, পরদুঃখকাতরতা, ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এই সময় হইতে কোন অভাবনীয় ঘটনাস্রোত তাঁহার জীবনপ্রবাহকে অন্য পথে লইয়া গেল। ঐ ঘটনাটি তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ। মধুর খৃষ্টান হইবার প্রকৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে শুনা যায় এক জমীদারের কুরূপা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হওয়া এবং সে বিবাহে তাঁহার অনিচ্ছা, পক্ষান্তরে কোন সুন্দরী খৃষ্টানবালিকার প্রতি অনুরক্তিই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের প্রধান কারণ, আরও এই বিবাহে তাঁহার ইংলণ্ড গমনের সুযোগ ঘটিবে ভাবিয়া তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের নিকট যাইয়া খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রেভারেণ্ড ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মিষ্টার বার্ডের নিকট লইয়া যান। তিনি মধুকে দীক্ষা দিবার জন্য খ্রীষ্টান যাজকদিগের

হস্তে সমর্পণ করেন। পাছে মধুর আত্মীয়গণ মধুকে যাজকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন, সেই ভয়ে তাঁহারা মধুকে একবারে ফোর্টউইলিয়মের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। রাজনারায়ণ একজন খ্যতনামা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তিনি পুত্রের উদ্ধারার্থে অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে কতিপয় দিবস কেল্লায় বন্দীর ন্যায় থাকিয়া ১৮৪৩ খৃঃ ৯ ফেব্রুয়ারী মধু আর্চডিকন ডিল্ট্রীর নিকট লণ্ডন মিশন চার্চ্চ নামক ধর্ম্মমন্দিরে দীক্ষিত হন। সেই দিন হইতে তাঁহার নামের সহিত "মাইকেল" নাম সংযুক্ত হয়।

খ্রীষ্টান হইয়া মধু পিতৃভবন ত্যাগে বাধ্য হইলেন, কিন্তু মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। মধুর গৃহত্যাগ অবধি তাঁহার জননীর আহার নিদ্রা ছিলনা, উন্মাদিনীর ন্যায় হন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মধুর পিতা পুত্রকে গৃহে আনিতেন, এবং জাহ্নবীও পূর্ব্ববৎ স্নেহে তাঁহাকে আহারাদি করাইতেন। অনেক অনুরোধেও মধু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার অন্যায়াচরণ বিস্মৃত হইয়া বিধর্ম্মী পুত্রের শিক্ষার্থে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মধুর ইচ্ছানুসারে শিবপুরের বিশপ্স কলেজে য়ুরোপীয় বালকদের সহিত মধুকে রাখিলেন। খৃষ্টান হইবার সঙ্গে সঙ্গে মধুর গার্হস্থ্যজীবনের গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার মান্দ্রাজগমন, ইংরাজ মহিলার পাণি-গ্রহণ, সাংসারিক অভাব, আত্মীয় স্বজনের স্নেহবিচ্যুতি এবং শেষে অনাথের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু প্রভৃতি তাঁহার বিধর্ম্মী হইবার ফল। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অর্থাভাব দূর হইল না দেখিয়া তিনি মাতৃভাষায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে রাজা প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির সাহায্য ও উৎসাহে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করেন। মধু চারি বৎসর মাত্র বিশপ্স কলেজে পড়িয়া নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মধু বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ব্যতীত

লাটিন, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ, ইতালিয়ান এই কয়েক ভাষায় কথা কহিতে ও পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত, পারশিক, হিব্রু, তেলগু, তামিল ও হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁহার অধিকার হইয়াছিল। বাঙ্গালা ছাড়া বারটি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অধিকার হয়।

মাতৃ অনুরোধে মধু পিতৃগৃহে আসিতেন, কিন্তু ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার সম্বন্ধে পিতার সহিত মধুর বিবাদ বাধিত। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া অবশেষে মাসিক সাহায্য বন্ধ করেন। অর্থাভাব, ইংলণ্ড গমনে নিরাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি বহু কারণে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি রহিল না। অবশেষে তিনি শান্তির আশায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া হঠাৎ একদিন গোপনে মান্দ্রাজ চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তাঁহার নিকট এক কপর্দ্দকও ছিল না। পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাহাও ফুরাইয়া গেল। এই নিঃসম্বল অবস্থায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কষ্টের অবধি রহিল না। কলিকাতা বাসকালে তাঁহার জননী তাঁহাকে গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন, সুতরাং তাঁহার কোন কষ্টই ছিলনা। এখন নিরুপায় হইয়া তিনি মান্দ্রাজের দেশীয় খৃষ্টান-দিগের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তাঁহারা মধুর দুঃখ দেখিয়া মধুকে অনাথ ফিরিঙ্গি বালকদিগের অধ্যাপকতায় নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি অর্থাগমের জন্য সাহিত্যানুশীলনে বাধ্য হন। তিনি মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এখানেও মধু একজন সুলেখক ও পণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

এখানে তিনি প্রথমে এক ইংরাজ দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই এ পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পরে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী ও তদ্গর্ভজাত পুত্র কন্যার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছিল। শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণকে

আমরা মধুর প্রকৃত সন্তান বলিব। যে প্রথমা স্ত্রীর সংসর্গে তিনি প্রীতি-পূর্ণ উন্মাদ কবিতায় তাঁহার প্রণীত "ক্যাপটিভ লেডীর" প্রারম্ভে গাইয়া গিয়াছেন: সেই অসংযমী পুরুষ সুখের আশায় নিরাশ হইয়া দ্বাদশবর্ষ পরে আত্মবিলাপে বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

প্রেমের নিগড় পরি, পরিলি যতনে সাধে, কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক শিখা—লোভে তুই কাল ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি, এবেরে পরাণ কাঁদে"।

অপরিণামদর্শী মধু কলঙ্কের মর্ম্মভেদী যাতনায় অস্থির হইয়া আত্ম-মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "ক্যাপটিভ লেডী" শিক্ষিতসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছিল। পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবকের পক্ষে বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রশংসা পাওয়া কম গৌরবের কথা নহে। মধু আলস্যে সময় নষ্ট করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বাবু লিখিলেন, 'এরূপভাবে সময় কাটান তোমার কর্ত্তব্য নহে, তুমি যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত করিতে, তাহা হইলে তাহা কত ফলপ্রদ হইত।' প্রত্যুত্তরে মধু জানাইলেন, "আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালক অপেক্ষা অধিক কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্য প্রণালী এইরূপ—প্রাতে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হিব্রু, ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য, ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক, ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও তেলগু, ৫ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন, রাত্রি ৭ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরাজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে, আমি মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না।" এই সময়ে কতকগুলি কারণে তিনি মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। মান্দ্রাজে বাসকালে তাঁহার পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। মধুর আত্মীয়গণ মধুর মৃত্যু

স্থির করিয়া তাঁহার পিতৃ সম্পত্তি দখল করিয়া বসে। মধু এই সংবাদ পাইয়া স্বদেশে আসেন।

আট বৎসর প্রবাসের ফলে তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইংরাজী পত্নীগ্রহণে ও বিজাতীয় সংসর্গে কণ্ঠস্বরে, আহারে, পরিচ্ছদে এবং আচারে, ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ বৈদেশিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলকাতায় আসিয়া বিধর্ম্মী মধু তাঁহার আত্মীয় বন্ধুর নিকট আশ্রয় পাইলেন না। গৌরদাস বাবু তাঁহাকে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে কেরাণীগিরি কাজ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দ্বিভাষীর পদে উন্নীত হন। ঐ সময় সংবাদপত্রে লিখিয়াও তাঁহার কিছু আয় হইত। এই সময়ে পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার তাঁহার প্রথম কার্য্য হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃঃ মার্চ্চমাসে ছাতু বাবুর বাটিতে শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়া পাইকপাড়ার রাজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উদ্যোগে বেলগাছিয়ার উদ্যানে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয় এবং মধু রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেন, তাহাতে মধু রাজাদিগের নিকট হইতে ৫০০ টাকা পুরস্কার পান। এই রত্নাবলীতে তাঁহার প্রশংসা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার পর শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন। যে মধু একদিন পৃথিবী স্থলে "পৃথিবী" লিখিয়াছিলেন, আজ সেই ইংরাজীনবীশ মাদ্রাজী সাহেবকে বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। শর্ম্মিষ্ঠার পর তিনি ১৮৬০ খৃঃ মধ্যে যথাক্রমে "একেই কি বলে সভ্যতা," "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোয়া," "পদ্মাবতী নাটক," "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য" তৎপরে ১৮৬১ খৃঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', ১৮৬২ খৃঃ 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' আরও দুইখানি কাব্য আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থাভাব জন্য শান্তিশূন্যতাই তাঁহার প্রতিভাহ্রাসের কারণ। হরিশের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিনের জন্য "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রিকার নিয়মিত লেখক হন। তৎপরে

তিনি পিতৃ সম্পত্তি পত্তনী দিয়া ১৮৬২ খৃঃ ৯ জুন কাণ্ডিয়া নামক জাহাজে বারিষ্টারী পড়িতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যাত্রাকালে তিনি বঙ্গভূমির উদ্দেশে যে কবিতা লেখেন তাহাতেই তাঁহার স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৬২ খৃঃ জুলাই মাসে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। এ সময়েও অর্থাভাবে তাঁহাকে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয়। "বিদ্যাসাগর" না থাকিলে তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইত না। তাঁহার অর্থাভাবের কথা মনে হইলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ১৮৬৪ খৃঃ ২রা জুন ভার্সেলিস্ নগর হইতে তিনি বিদ্যাসাগরকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে প্রকাশ যে "দেনার দায়ে তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্যই বা তাঁহাকে ফরাসী কারাগারে যাইতে হয়, তাঁহার বিষয় হইতে প্রাপ্য চারি হাজার টাকার কিছু পাইলে তিনি বাঁচিতে পারেন; অথবা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মধ্যস্থ থাকিয়া তাঁহার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ১৫ হাজার টাকা কর্জ্জ লইলে তিনি দেনা শোধ করিয়া বর্ত্তমান আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।" য়ুরোপ প্রবাসকালে স্ত্রীপুত্র লইয়া তাঁহাকে কি কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পত্রে ব্যক্ত আছে। ভার্সেলিসে বাসকালে কোনও ফরাসী দাতব্য-সমিতি তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, তাঁহার গৃহের দ্বারে আহার্য্য ও শিশুদিগের জন্য দুগ্ধ রাখিয়া যাইত। অর্থাভাবে তিনি পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডবাসকালে বারিষ্টার উমেশচন্দ্র, মনোমোহন ঘোষ, ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য হয়। এই সময়ে তিনি 'চতুর্দ্দশপদী' কবিতাবলী, ইংরাজীতে 'সীতাচরিত,' কতকগুলি 'খণ্ড কবিতা' এবং বাঙ্গালায় 'সুভদ্রা হরণ' ও 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' নামে দুইখানি গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিয়া যান।

১৮৬৭ খৃঃ বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মার্চ্চ মাসে স্বদেশে

আসেন এবং কলিকাতার হাইকোর্টে বারিষ্টারী আরম্ভ করেন। বারিষ্টারিতে তাঁহার লাভ হয় নাই বরং তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছিল। তাহা হইলেও তিনি প্রথম প্রথম মাসিক প্রায় দেড় হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃই হ্রাস হয়। ইংলণ্ড হইতে আসিয়া মধু ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি নীতিমূলক কবিতামালা, হেক্টরবধ ও মায়াকানন রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি এ তিনখানি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কেবল যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতার জন্য তিনি অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা নহে, অনেক সদনুষ্ঠানেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না। এমন কি নিজের সংসার নির্ব্বাহের জন্য তিনি যে ঋণ করিয়াছেন, কোন পরিচিত লোকের দৈন্য জানিলে তিনি সেই অর্থে তাহার কষ্ট নিবারণ করিতেন। মনোমোহন বলিতেন যে কাহাকেও সাহায্য করিবার সময় মধু কখনও গণনা করিয়া টাকা দিতেন না, এক মুষ্টিতে কি দুই মুষ্টিতে যাহা উঠিত, তাহা দিয়া প্রার্থীকে বিদায় করিতেন। যতক্ষণ কিছু সম্বল থাকিত, সৎকার্য্যেই হউক কি অসৎকার্য্যেই হউক, ধূলি মুষ্টির ন্যায় তিনি অকাতরে ব্যয় করিতেন।

একবার তাঁহার কোন বাল্যবন্ধু এক ব্যক্তিকে লইয়া মধুর নিকট একটী মোকর্দ্দমার পরামর্শ লইতে যান। মধুর পরামর্শে প্রীত হইয়া ঐ লোকটি পারিশ্রমিক দিতে উদ্যত হইলে মধু তাহা লইলেন না, পরে বন্ধুকে বলিলেন, তুমি যখন আত্মীয়বোধে উহাকে আনিয়াছ, তখন কি টাকা লইতে পারি, কিন্তু আমার গৃহে আজ এক কপর্দ্দকও নাই, যদি তোমার সঙ্গে টাকা থাকে, তবে আমার স্ত্রীকে ৫৲ টি টাকা দিয়া বলিয়া আইস, যেন সময় মত আহার্য্য প্রস্তুত হয়। তাঁহার এই উদারতা প্রসংশনীয় হইলেও তাঁহার ঋণ পরিশোধে ঔদাসীন্য বড়ই পরিণামকষ্টকর। এই ঋণের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইত, তখন তিনি অবিরত মদিরা-

পানে তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিতেন। মনোমোহনের সাক্ষাতে তিনি মদিরাপানের কথায় বলিয়াছিলেন, "কণ্ঠে নিজে অস্ত্রাঘাত করা অপেক্ষা এইরূপে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।" হতভাগ্য কবির শেষ জীবন কি নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা ঐ সকল ঘটনাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। বিধাতা তাঁহাকে অনবদ্য স্বাস্থ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, স্নেহময় পিতামাতা, সকলই দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজদোষে সে সকলই হারাইয়াছিলেন।

শেষ জীবনে মধু বারিষ্টারী ছাড়িয়া প্রিভি কৌন্সিলের অনুবাদকের কার্য্য এবং তৎপরে পঞ্চকোটের রাজার আইনউপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন। পরে ১৮৭২ খৃঃ তিনি ঐ কার্য্যত্যাগে কলিকাতায় আসেন এবং পীড়িত হন। ১৮৭৩ খৃঃ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে তাঁহার পত্নীও কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হন। স্ত্রীর এই অবস্থা, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব, দুইটী শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ভার, তাহার উপর ঋণদাতাদিগের পীড়নে মধু উন্মাদপ্রায় হইয়াছিলেন। এত দিন বন্ধুদিগের সাহায্য ও ঋণের উপর কোন ক্রমে দিন চলিতেছিল। তৎপরে পরিচ্ছদাদি ও গৃহসামগ্রী বিক্রয়ে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া পতি পত্নী উভয়কেই অনাহারে দিনপাত করিতে হইল। রোগ শয্যায় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ মধুকে সাহায্য করেন। মধু ও তাঁহার পত্নী মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে উত্তরপাড়াস্থ প্রসিদ্ধ জমীদার তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় বাস করিতে অনুরোধ করায়, তিনি ২।৩ মাস গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী গৃহে যাইয়া বাস করেন। মৃত্যুশয্যাতেও তিনি কাব্যানুশীলনে বিরত হন নাই। একদিন গৌরদাস বাবু উত্তরপাড়ায় যাইয়া দেখেন, মলিন শয্যায় শুইয়া মধু মুহুর্মুহু রক্ত বমন

করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী নিম্ন গৃহতলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। নিজের রোগযন্ত্রণা হইতে স্বামীর অবস্থা হেন্‌রিটিয়ার অধিক ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি গৌরদাস বাবুকে দেখিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য চিন্তা নাই, আমি মরিতে ভয় করি না, যদি পারেন, আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করুন।" উত্তরপাড়ায় রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বে মধু কলিকাতায় আসেন। বন্ধুগণ তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার ভবনে রাখিয়া তাঁহাকে আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করেন। এই সময়ে উমেশচন্দ্র ও মনোমোহন তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁহারা এই অর্থব্যয়ে যদি তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে না রাখিয়া অন্যত্র রাখিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের একটি গুরুতর লজ্জা রক্ষা হইত। নিজের সুখের জন্য মধু যে জনকজননীর প্রাণে বেদনা দিয়া বিধর্ম্মী হন, দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা এতদিন পরে তাঁহার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল। এই যন্ত্রণার মধ্যে যখন তাঁহার চৈতন্য হইত, তখন পীড়িতা পত্নী ও শিশু দুইটীর কথা মনে করিয়া তিনি বালকের মত কাঁদিতেন। মধুর মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মধুর অভিমতে মনোমোহন মধুর শুশ্রূষার জন্য চিকিৎসালয়ের পরিচারক ও ধাত্রীকে প্রত্যহ একটী করিয়া টাকা দিতেন। মধু শেষ সময়ে মনোমোহনকে তাঁহার শিশু দুইটীকে পালন জন্য অনুরোধ করিয়া যান, তিনিও তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পরে মধু তিন দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া ১৮৭৩ খৃঃ ২৯ জুন রবিবার বেলা দুইটার সময় পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে ডাকাইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। বাল্যে যাঁহার সেবার্থে দাসদাসীরা সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত, পাছে কিছুর ক্রটী হয়, এই চিন্তায় যাঁহার পিতামাতা ও আত্মীয়গণ ব্যাকুল থাকিতেন, আজ এই শেষ দিনে চিকিৎসালয়ের ভৃত্য ও ধাত্রী ভিন্ন তাঁহার মুখে জল

গণ্ডূষ দিতে কেহ নিকটে ছিল না। রাজপথের ভিক্ষুক ও অনাথগণের সহিত একত্রে বঙ্গের বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি প্রাণত্যাগ করিলেন। যে কার্য্যের জন্য মধুকে বিধাতা জগতে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, মাতৃভাষার সেবা করিয়া এবং আত্মসংযমের অভাবে প্রতিভার পরিণাম কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহার অমরাত্মা ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিল। তাঁহার মানবজন্ম বৃথা হয় নাই; তিনি তাঁহার স্বদেশকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। সে জন্য তিনি বিধাতার নিকট পুরস্কৃত হইবেন। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালী সত্যই তাঁহার কাব্য সমূহ হইতে

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

শিয়ালদহের নিকটে খৃষ্টান সেমিট্রিতে তাঁহার সমাধি হয়। দুঃখের বিষয় তৎকালে তাঁহার সমাধিস্তম্ভে স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয় নাই। ইহার বহুবর্ষ পরে ১৮৮৮ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর কতিপয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায়, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন স্বয়ং তাঁহার যে সমাধিলিপি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সমাধিস্তম্ভে তাহা উৎকীর্ণ হইয়াছে,—

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্যারীচরণ সরকার।

১৮৩২ খৃঃ ২৮শে মাঘ কলিকাতায় মাতামহগৃহে প্যারীচরণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রের পার্ব্বতীচরণ, প্যারীচরণ, প্রসন্নকুমার ও রামচন্দ্র এই চারি পুত্র। ভৈরবচন্দ্র কলিকাতার খ্যাতনামা গ্রন্থবিক্রেতা থ্যাকার কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম করিতেন এবং জাহাজের রসদ সরবরাহ করিতেন। তিনি বড় ধার্ম্মিক, দয়ালু ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জননী দ্রবময়ীও অশেষ রূপ-গুণসম্পন্না আদর্শরমণী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিতা ছিলেন। প্যারীচরণের পূর্ব্বপুরুষ বীরেশ্বর তহশীলদারী কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে "সরকার" উপাধি দেন। প্যারীচরণের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান প্রথম কৃষ্ণনগরে পরে হুগলী জেলার তড়াগ্রামে ছিল। তৎপরে তাঁহার পিতামহ শিবরাম কলিকাতাবাসী হন। ইঁহারা সন্মৌলিক কায়স্থ ছিলেন।

প্যারীচরণ প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট কিছুদিন পড়িয়া পরে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। পার্ব্বতী বাবু সিনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তৎপরে প্যারীচরণ দশম কি একাদশ বৎসর বয়সে ঢাকায় যান এবং পার্ব্বতীবাবু যে স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেই স্কুলে প্রবেশ করেন। তথায় তিন বৎসর পড়িয়া পুনরায় কলিকাতায় আসেন ও হেয়ারস্কুলে ভর্ত্তি হন। প্যারীচরণের জীবনের প্রায় সমস্ত সময় হেয়ারের সংসর্গে অতিবাহিত হওয়ায়, মহাত্মা হেয়ারের মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্তে ও তাঁহার সুশিক্ষাগুণে উত্তরকালে প্যারীচরণ একজন দেশপূজ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। হেয়ার ছাত্রগণকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। নিরন্ন ও পীড়িত ছাত্রের অন্ন ও ঔষধের ব্যবস্থা, নিজহস্তে শুশ্রূষা, আর্ত্তকে সান্ত্বনা এবং দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছাত্রগণকে

সুপথে আনিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন ; ছাত্রদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতেন। প্যারীচরণের মধুর চরিত্রগুণে হেয়ার তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, সততা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য প্যারীচরণ স্কুলমধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৩৮ খৃঃ প্যারীচরণ হেয়ারস্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পান এবং হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন :—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, দুর্গাচরণ লাহা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইঁহাদিগের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্যারীচরণ ১৮৩৯ খৃঃ ভর্ত্তি হন এবং ছয় মাস মাত্র পড়িয়া বীজগণিতের পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হওয়ায় পারিতোষিক পান। স্থিরভাবে বসিলেই তন্দ্রাগত হওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সজাগতা নষ্ট হইত না। একদা মেকলে সাহেব স্কুলে আসিয়া জনৈক ছাত্রকে একটী প্রশ্ন করেন এবং ঐ ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় তিনি ক্রমশঃ সকল ছাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিতে না পারায় সাহেব প্যারীচরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবামাত্র তিনি ঐ প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিলেন। ইহাতে সাহেব বিস্মিত হইয়া অধ্যাপককে বলিয়াছিলেন 'এ বালকটীকে যে আমাদের ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীর মতন দেখ্‌ছি'—(তাঁতীরা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তাঁত বুনে)।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে প্যারীচরণ ১৮৪১ খৃঃ সিনিয়র পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হওয়ায় সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি ৪০৲ টাকা পান। তিনি উপর্য্যুপরি তিন বৎসর এই সিনিয়র পরীক্ষা দেন এবং তিন বৎসরই সর্ব্ব প্রথম হওয়ায় মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। এই সময়ে তিনি লাইব্রেরীপদক পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৪৩ খৃঃ

ডিসেম্বর মাসে তিনি সাংসারিক দুর্ব্বিপাক বশতঃ কালেজ ত্যাগে বাধ্য হন এবং ঐ বৎসরেই তিনি "ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাষ্পীয় পোত গমনাগমনের ফল" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া এবং দুই বৎসর পূর্ব্বের লিখিত আর একটী রচনার জন্য দুইটী পারিতোষিক পান। তিনি শিক্ষা সমাপ্তে হিন্দু কালেজ হইতে চলিয়া আইসাকালীন ঐ কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ, ইংরাজ ও বাঙ্গালী অধ্যাপক এবং শিক্ষাসভার সদস্যগণ প্যারীচরণকে প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র স্কলার্শিপপ্রাপ্তির জন্য যে সার্টিফিকেট পত্র দেন, উহাতে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, ইহা বিশেষভাবে উল্লিখিত ছিল।

পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্যারীচরণের পিতৃবিয়োগ ঘটে। ঐ সময়ে সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের অস্বচ্ছলতার জন্যই হউক কিম্বা মিতব্যয়িতার জন্যই হউক, তিনি ছাত্রগণের পরিত্যক্ত পেন কলমগুলিতে লিখিতেন ও উড়ানীকে দ্বিখণ্ড করিয়া লইয়া অর্দ্ধভাগ মাত্র ব্যবহার করিতেন। কিন্তু শীঘ্রই পার্ব্বতী বাবুর বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের আর্থিক কষ্ট দূর হয়। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই প্যারীচরণ জ্যেষ্ঠতাত পুত্র কর্ত্তৃক "বাস্তু-ভিটা" ছাড়া হন। পার্ব্বতী বাবু তখন হুগলীতে এবং তাঁহারা তিন ভ্রাতা বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার এই জ্যেষ্ঠতাত পুত্রটী অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। একদিন তাঁহারা স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রে আসিয়া দেখেন, জ্যেষ্ঠতাত পুত্র এক লগুড় হস্তে বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বলিলেন—"বাটী প্রবেশের চেষ্টা করিলেই লাঠি দিয়া মাথা ভাঙ্গিব"। নিরীহপ্রকৃতি প্যারীচরণ জ্ঞাতি বিরোধ অনুচিত বোধে সেই চিরপ্রিয় ভদ্রাসনের দ্বারদেশ হইতে সাশ্রু-নেত্রে বিদায় লইয়া নিকটস্থ চোরবাগানে মাতামহালয়ে আশ্রয় লইলেন। তদবধি তাঁহারা পরিবারস্থ সকলে মাতামহীর সহিত বাস করেন। এই বাটীর এক তৃতীয়াংশ মাতামহীর উত্তরাধিকারী স্বরূপ তাঁহারা চারি ভ্রাতা

প্রাপ্ত হয়েন এবং ঐ বাটী প্যারীচরণের স্মরণীয়নামে খ্যাতি লাভ করে। ১৮৪২ খৃঃ ঊনবিংশতিবর্ষ বয়ক্রমকালে হাটখোলার বিখ্যাত রাজা মাণিক বসুর বংশীয় শিবনারায়ণ বসুর কন্যার সহিত প্যারীচরণের বিবাহ হয়। ইহার এক বৎসর পরে চারিটী শিশু পুত্র ও পত্নী রাখিয়া পার্ব্বতী বাবু লোকান্তরিত হন। ইহার অল্পদিন পরেই পার্ব্বতী বাবুর স্ত্রীও গতায়ু হন। অপর দুইটী (গোপাল ও ভুবন) ভ্রাতাকে প্যারীচরণ পুত্রনির্ব্বিশেষে লালনপালন ও শিক্ষাদান করেন। এই ভ্রাতৃশোকে তিনি বড় কাতর হন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে অর্থাগমের চেষ্টা করিতে হয়। তাঁহার ভ্রাতার শূন্যপদে হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যের জন্য তিনি আবেদন করেন। কিন্তু তাঁহার কোনও বাল্যবন্ধু তৎকালে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন এবং ন্যায়মত তাঁহারই ঐ পদ প্রাপ্য জানিয়া তিনি অবিলম্বে দুই শত টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যের পরিবর্ত্তে ৮০৲ টাকা বেতনের কার্য্যের জন্য আবেদন করেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্য প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৪৩ খৃঃ ১০ ডিসেম্বর সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৪৫ খৃঃ ৮ই ডিসেম্বর দেড়-শত টাকা বেতনে তিনি বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া ঐ স্থানে গমন করেন।

এই বারাসতে প্যারীচরণ অনেকগুলি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বারাসতের কার্য্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কৃষিবিদ্যালয়। তিনি বারাসত স্কুলের ছাত্রগণের অবসর কালে শিক্ষার জন্য প্রথমে একটী কৃষিশিক্ষাশ্রেণী স্থাপনা করেন। ইহাই এদেশে কৃষিবিদ্যালয়ের অগ্রণী। এই কার্য্যে তিনি সকলের নিকট বহু প্রতিকুলাচরণ প্রাপ্ত হইয়াও যেরূপ দৃঢ়তা ও উৎসাহের সহিত ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। তন্মধ্যে বারাসতের অলঙ্কার স্বরূপ মহাপণ্ডিত কালিকৃষ্ণ মিত্র ও বিখ্যাত ডাঃ নবীনকৃষ্ণ

মিত্র নামক সদাশয় ভ্রাতৃদ্বয় প্যারীচরণকে তাঁহার সমুদয় সৎকর্ম্মে অর্থে ও সামর্থ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার সহিত সুদৃঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই তিনি তদ্দেশবাসিগণের সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়া উক্ত দেশস্থ লোকের নিকট পূজিত হইয়াছিলেন। তিনিও যেরূপ আন্তরিকভাবে বারাসতনিবাসিদিগের হিতান্বেষণে সতত নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারাও তদ্রূপ তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। তিনি গোপাল, ভুবন ও আরও কয়েকটী ছাত্র লইয়া প্রথমে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করেন। তিনি নিজ হস্তে কোদালী ও নিড়ানী লইয়া ক্ষেত্রের কার্য্য করিতেন। তিনি নিজে রসায়নশাস্ত্র ও উদ্ভিজ্জবিদ্যা সর্ব্বদা পড়িতেন এবং ছাত্রগণকেও উক্ত বিষয়ে গ্রন্থাদি আনাইয়া পড়াইতেন। ছাত্রদের ভূমিখণ্ডে জাত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় হইত ও ঐ অর্থে ছাত্রদের পুরস্কারবিতরণ এবং ঐ স্কুলের উন্নতিসাধন হইত। তদ্ব্যতীত তিনি পুষ্করিণীখনন ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে ও শিক্ষাগুণে বৎসরের মধ্যেই স্কুলটী একটী অতি উচ্চদরের বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। তৎকালে জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ স্কুল দেখিয়া যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—"সে সময়ে বারাসত স্কুলের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ আর কখনও হয় নাই। ইহা তৎকালে যেন একটী প্রকাণ্ড কালেজে পরিণত হইয়াছিল। আমি আজিও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি, যেন প্যারীবাবু সেই নন্দনকাননস্থিত সেই রমণীয় পাঠমন্দিরে ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকে মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ করিতেছেন। সেই উদ্যানের কোথাও ফুল, কোথাও শাক সবুজী উৎপন্ন হইয়া চিত্তবিনোদন করিতেছে। এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক শোভা, অন্যদিকে সেইরূপ মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ। তাঁহার চরিত্রগৌরবে বারাসত যেন তৎকালে তপোবনে পরিণত হইয়াছিল। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা, কল্পনা নহে।"

ছাত্রাবাস—তিনি প্রবাসী ছাত্রগণের জন্য ঐ স্কুলের সীমার মধ্যেই একটী বাঙ্গলো প্রস্তুত করান। তাঁহার সুবন্দোবস্তে ছাত্রগণ উহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিত। এখনও বারাসতে ঐ ছাত্রাবাস বর্ত্তমান আছে। তবে এখন বাঙ্গলো স্থলে একটী দ্বিতল বাটী হইয়াছে। "বারাসত স্কুল কমিটী"—বীডনশাখা সমিতি—বারাসত ছাত্রগণের সাহিত্যচর্চ্চা, উপস্থিত বুদ্ধি ও বক্তৃতাশক্তির উন্নতিকল্পে প্যারীচরণ ঐ সভা স্থাপিত করেন। "পরীক্ষণীয় শ্রেণী"—এই শ্রেণী তৎকালে ছাত্রদের প্রথম ইংরাজী পাঠোপযোগী ছিলনা। তিনি এই অভাব মোচনার্থ তাঁহার বিখ্যাত "ফার্ষ্ট বুক অব রিডিং" প্রণীত করেন, এবং এই স্কুলে একটী পরীক্ষণীয় শ্রেণী খুলিয়া তাহাতে কতিপয় ছাত্রকে নিজমতানুসারে শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন।

"বালিকা বিদ্যালয়"—১৮৪৭ খৃঃ প্যারীচরণ কয়েকটী শিক্ষিত লোকের সাহায্যে বারাসতে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে কালীকৃষ্ণ মিত্রই বিশেষভাবে যোগ দেন। তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন যে কিরূপ কঠিন ছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদিগের দুইজনের লাঞ্ছনা ও সমাজচ্যুতির ভয় হইয়াছিল; অবশেষে বিপক্ষগণ তাঁহাদিগের প্রাণবধেরও চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তথাপিও তাঁহারা নিরস্ত হন নাই।

"শ্রমজীবীদিগের বিদ্যালয়"—১৮৪৯ খৃঃ তিনি এই স্কুল স্থাপিত করেন। ইহাতে শ্রমজীবীদিগকে লেখাপড়া, গণিত, কৃষিবিদ্যা, ঝুড়ি, কুলা, ডালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা শিক্ষা দেওয়া হইত। কালীকৃষ্ণ, প্যারীচরণ ও অন্যান্য শিক্ষকগণ ইহাদের শিক্ষা দিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বারাসতে গরীব দুঃখী ও স্কুল ছাত্রদিগের মধ্যে দান ধ্যানেরও অনেক কথা জানা যায়। ১৮৪৪ খৃঃ প্যারীচরণ কলিকাতার কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া চলিয়া আসিবার সময়, বারাসতের কি ইতর কি ভদ্র সকলেই

তাঁহার অপার গুণরাশি স্মরণ করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছিল এবং তাঁহারও বারাসতের সেই মধুর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিতে প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তথাকার সে করুণ বিদায়দৃশ্য তিনি কোন দিনও ভুলিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় আসিয়া প্যারীচরণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষকতা কার্য্যে প্রশংসা পাইলেন। এই সময়ে হেয়ার স্কুলের ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ প্রথম শ্রেণীতে অতিশয় ছাত্র সমাগম হইয়াছিল। ঐ সময়ে প্যারীচরণ তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য পাঁচ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৫৬ খৃঃ তাঁহার প্রণীত পাঠ্য পুস্তক সকল এদেশীয় অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও ভারতের অপরাপর প্রদেশের স্কুলসমূহে সাদরে গৃহীত হয়। এই স্কুলে আসিয়া তিনি প্রথমে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি, ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের জন্য টানা পাখার ব্যবস্থা, প্রভৃতি অনেকগুলি সুবিধাজনক নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হন। পূর্ব্বে একজন সরকার ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইত ; তিনি সে নিয়ম রহিত করিয়া ছাত্রগণের স্ব স্ব শ্রেণীর শিক্ষকের নিকট বেতন দেওয়া নিয়ম করিলেন। তৎকালে ঐ স্কুলের নাম ছিল "কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল"। তাঁহারই চেষ্টার ফলে ঐ স্কুলের "হেয়ার স্কুল" নামকরণ হয় এবং তাঁহারই নিরতিশয় যত্নে ১৮৭৫ সালে বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলের বাটী নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার জন্য অল্প বেতনে চোরবাগানে "প্রিপারেটারী স্কুল" নামে একটী স্কুল স্থাপনা করেন। এই স্কুলের ছাত্রগণকে তিনি অন্ন, বস্ত্র, বেতন, বহি, রোগে ঔষধ প্রভৃতি অকাতরে দান করিতেন। প্রবাসী ছাত্রদিগের জন্য "ছাত্রাবাস" (বর্ত্তমান হিন্দু হোষ্টেল) প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র ছাত্রাবাস এক্ষণে বৃহদায়তনে পরিণত হইয়া "ইডেন হোষ্টেল" নামে পরিচিত হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ প্যারীচরণ অল্পবয়স্ক

ছাত্রগণের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সুনীতি ও সদ্ব্যবহার শিক্ষার্থ "বালক-সম্মিলনী" এবং বড়দিগের জন্য "ছাত্র-সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৩ খৃঃ তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও আজীবন ঐ স্কুলের ব্যয়ভার বহন করেন। একসময়ে ঐ স্কুল বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এখনও ঐ স্কুল বর্ত্তমান আছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রারম্ভ সময়ে যখন শিক্ষিত সমাজ মধ্যে পানদোষ প্রবলতর বেগে প্রবেশ করিয়া সমাজকে বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে সুরাপান বিরোধী প্যারীচরণ স্বদেশ ও সমাজকে ভীষণ সুরা রাক্ষসীর কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মাদকনিবারণী সভা স্থাপনা করেন। দেশের অনেকগুলি হৃদয়বান ব্যক্তি ঐ সভার সদস্য হন। একবৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের নানাস্থানে চৌষট্টিটী উল্লিখিত রূপ ভ্রাতৃ-সমিতি স্থাপিত হয়, ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অবধি এইরূপ শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্যারীচরণ ছুটীর সময় পশ্চিমাঞ্চলে ঐ শাখাসমিতিতে যাইয়া তত্রস্থ মাদকনিবারণী সম্প্রদায়কে উৎসাহ দিতেন। তিনি ঐ সভার উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। উহার যাবতীয় লেখা পড়ার কার্য্য ও ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন। ঐ সভার মুখপাত্র স্বরূপ "ওয়েল উইশার" নামক একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র ও "হিত-সাধক" নামে একখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তৎকালে এই উভয় পত্রই সমধিক আদৃত হয়। "ওয়েল উইশার" ইউরোপে পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি কখনও ভীতিপ্রদ প্রাঞ্জলচিত্রে, কখনও সৎ উপদেশে, কখনও বা সুরাপায়ীগণের জঘন্য আচরণে সুরার প্রতি ঘৃণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি "মাদক সেবন তরু" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম, সহৃদয়তা ও ইংরাজি রচনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্যারীচরণ ও রাজেন্দ্র দত্ত ইহারা দুইজনই এদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা। শুনা যায়, ডাঃ মহেন্দ্র সরকার অধিকন্তু প্যারীচরণের পরামর্শ ক্রমেই উক্ত চিকিৎসার পক্ষপাতী হন। তাঁহার কোন আত্মীয় বলেন যে প্যারীচরণ সে সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচারার্থ মাসে ৫০ ৬০ টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি শিক্ষার্থী-দিগের জন্য পুস্তক ও ঔষধ ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন এবং দরিদ্রদিগের জন্য তদীয় চোরবাগানের বাটীতে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি "এডুকেশন গেজেটে" উহা-দিগের সাহায্যার্থ জনসাধারণকে কাতরে অনুনয় করেন এবং তিনি নিজে চাঁদার খাতা হাতে করিয়া ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। ঐ অর্থে নিজ অর্থ সংযোগ করিয়া স্বীয় বাটীর সম্মুখে "চোর-বাগান অন্ন ছত্র" নামে এক অন্নছত্র খুলেন। তাহাতে তিনি নিজ আত্মীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে আপন হস্তে পরিবেশন করিয়া তিন চারি মাস ক্রমাগত প্রতিদিন পাঁচ ছয় শত লোককে আহার করাইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু ডাঃ বেরিণি ও রাজেন্দ্র দত্ত অন্নছত্রে থাকিয়া পীড়িতের ঔষধ দান করি-তেন। পর বৎসর ১২৭৪ সালের প্রসিদ্ধ ভীষণ ঝটিকার সময় প্যারীচরণ হৃতসর্ব্বস্বব্যক্তিগণের জন্য যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও তদর্থে যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কোনও বন্ধু বলেন যে প্যারীচরণ কেবল টাকী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অন্ন বস্ত্র ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণার্থ তাঁহার হস্তে ঐ সময়ে পাঁচ শত টাকা অর্পণ করেন।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অ্যাট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের পরামর্শক্রমে ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে প্যারীচরণ এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তিনি ঐ পত্রিকার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে তিন শত টাকা বেতন পাইতেন এবং ঐ পত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ, পত্রের মুদ্রাঙ্কন ও পরি-চালনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্পাদকের গ্রহণ করিবার অনুমতি ছিল। তিনি

সম্পাদক হইয়া কালীকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সাহায্যে এবং নিজের যত্ন ও পরিশ্রমগুণে শীঘ্রই ঐ পত্রিকার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। প্যারীচরণ এডুকেশন গেজেটে গবর্ণমেণ্টের কোনও সত্য ঘটনা সম্বন্ধীয় স্বাধীন মত প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হন। অপর কেহ হইলে বোধ হয় উহা গ্রাহ্যই করিত না। কিন্তু স্বাধীনচেতা ও সত্যপ্রিয় প্যারীচরণ ঐ সামান্য ঘটনায় এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। তিনি দুই বৎসর মাত্র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঐ পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তাঁহার বাটীতে অনেকগুলি নিরন্ন আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিপালিত হইত; তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও একটী সহোদর দুইটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। এই ভ্রাতুষ্পুত্রগণ জ্ঞাতিবর্গ প্রভৃতি ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত কোনও পার্থক্য ছিল না। উভয়ের মধ্যে সামান্যরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইলে তিনি বড়ই সন্তপ্ত ও দুঃখিত হইতেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতেন। একদা তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভদ্রবংশীয় নিমন্ত্রিতগণের যোগ্য বিবিধ প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া দরিদ্রগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। তিনি আজীবন দরিদ্র ভোজনে অনুরক্ত ছিলেন।

১৮৬২ খৃঃ তাঁহার বেতন তিন শত টাকা হয়। ১৮৬৭ খৃঃ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার বেতন ঐ সময় হইতে গ্রেডেড সার্ব্বিসে ৭৫০ টাকা হয়। শিক্ষাবিভাগের "গ্রেডেড সার্ব্বিসে" তাহার পূর্ব্বে একজনমাত্র বাঙ্গালী প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে তিনি ছাপাখানার আয়, তাঁহার গ্রন্থ বিক্রয় ও চাকুরীতে মাসে প্রায় চারি পাঁচ সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তিনি এই সময়ে মাতামহী প্রদত্ত চোরবাগানের বাটী দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে ভাল করিয়া প্রস্তুত করেন। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানের অসংকুলান

বশতঃ তিনি চারি সহস্র টাকা ব্যয়ে হরিতকীবাগানে বৃহৎ বাটী প্রস্তুত করেন এবং চোরবাগানের বাটী ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে দিয়া নিজে নূতন বাটীতে বাস করেন। প্যারীচরণ বড় ধীর, গম্ভীর ও সহিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখনও রোগে কি শোকে অধীর হইতে দেখে নাই। সাহেব ডাক্তারগণ দুইবার অজ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ প্রচুর আহার করিতে পারিতেন, সেইরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমেও অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল। বারাসতে বাসকালে তিনি ১৪ মাইল পথ হাঁটিয়া বাটী আসিতেন। তাঁহার শরীরে বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি বাহিরে একখানি মাত্র সতরঞ্চ পাতিয়া বসিতেন এবং মাদুরে অর্দ্ধশয়ানে রচনা লিখিতেন। বড় বড় কাপড়ের পুলিন্দা লইয়া হাঁটিয়া বাটী আসিতেন।

সমাজ সংস্কারেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহে তিনিও যোগ দিয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্যের জন্য অনেক স্থানে অপমানিত হইয়াও ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি নিজেও এতদর্থে অনেক অর্থ সাহায্য করেন এবং এতদর্থে ঋণগ্রস্ত বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করিতে বহু চেষ্টা করেন। বহু বিবাহ, কন্যা বিক্রয়, বিবাহে পণ গ্রহণ, বাল্যবিবাহ, নারীজাতির প্রতি অত্যাচার প্রভৃতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। ঐসকল কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে তিনি অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন। বিদ্যাসাগরের বীরসিংহের স্কুলে তিনি স্বরচিত অনেক পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। প্যারীচরণের বন্ধুবর্গের মধ্যে কালীকৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ, প্রসন্নগুপ্ত, বিদ্যাসাগর এবং ইংরাজ বন্ধুগণের মধ্যে বীটন, ট্রেবর, হাইকোর্টের জজ ফিয়ার, অ্যাট্‌কিন্‌সন্, উড্রো, ডাঃ বেরিণি, ধর্ম্মযাজক ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা

করিতেন ও ভালবাসিতেন। প্রসন্ন গুপ্ত স্ত্রীপুত্রহীন হইলে প্যারীচরণ ভ্রাতৃস্নেহে ও পরম যত্নে আজীবন তাঁহাকে নিজ গৃহে রাখেন। তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যে পারদর্শীতার কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার সহযোগী প্রবীণ শিক্ষক ও তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে বলেন, "এমন শিক্ষক আর দেখি নাই।" কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাকে "শিক্ষকরাজ" বাক্যে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় বিরক্তি ছিল না। তিনি কলেজ হইতে বাটী আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ও আশ্রিত ৮।১০টী বালককে পড়াইতেন। তিনি ছাত্রদের কখনও মারিয়া অথবা রুষ্ট হইয়া শাসন করেন নাই। তিনি অত্যন্ত শিশুপ্রিয় ছিলেন। শিক্ষক নীলমণি বাবু বলেন যে, একদিন প্যারীবাবুর কোন কার্য্যের সময় একটী বালক অঙ্গুলীতে কালী লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে মাখিতে থাকে, চাপকান ফুড়িয়া ঐ আর্দ্রতা তাঁহার গাত্রে লাগিলে দেখিতে পাইয়া তিনি বালকটীকে কেবল বলিলেন, "ছি ! কালী দিলে" ! তাঁহার কোনও বন্ধু একদা তাঁহার বাটী যাইয়া দেখেন, তিনি তাঁহার সেকেণ্ডবুকের প্রুফ সংশোধন করিতেছেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া চারি পাঁচটী শিশু খেলা করিতেছে। তিনি দুই বেলা বাটীর সকল শিশুগণকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে লেখাপড়া করিতে বসিতেন। শিশুদিগকে তাঁহার ঘাড়েপিঠে উঠিতে দেখিয়া তাঁহার জনৈকবন্ধু শিশুদের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিতে বলায় তিনি বলেন, "বাটীর বধূ, কন্যাদের আয়াসের জন্যই তিনি উহাদের বাহিরে আনেন।" তাঁহার ছাত্রদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অনন্ত ভালবাসা এবং বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার ছিল। তাঁহার শাসন এইরূপ ছিল : তিনি বারাসতে শিক্ষকতা কালে একদা বালকদের পাঠের সময় তাসখেলা শুনিয়া তাহাদের কাছে আসিলেন এবং তাসগুলি চাহিয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। অনেক দুর্দ্দান্ত বালকও তাঁহার শিক্ষায় সুশান্ত হইয়াছে। তাঁহার ছাত্র জজ গুরুদাস বাবু বলেন যে, "প্যারীবাবুর মত অত সুন্দর শিক্ষা

দিবার প্রণালী তিনি আর কোন লোকের দেখেন নাই। তিনি এত সুন্দর পড়াইতেন যে ছেলেদের মনে যেন গাঁথা হইত। তাঁহার স্বর এত কোমল ও প্রাণস্পর্শী ছিল যে তাঁহার প্রত্যেক কথা বালকদের হৃদয়ে আঘাত করিত।"

প্যারীচরণের জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা অতিশয় প্রবল ছিল। সমাজ ও শিক্ষার্থীগণের হিতসাধন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তদর্থে তিনি লেখনী ধারণ করিতেন। তিনি দেশব্যাপী অজ্ঞান জনগণকে জ্ঞান বিতরণ ও সংবাদ পত্রে ছাত্রগণের শিক্ষোপযোগী রচনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেন নাই। ইংরাজি বাঙ্গালা উভয় রচনাতেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষি উদ্ভিজ্জ ও ভৌতিক বিদ্যায় তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ঐ সকল বিষয়ের রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি সাহিত্যের পরিচয় পাইয়া মহাপণ্ডিত ইংরাজ অধ্যাপকগণও মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার স্মরণ শক্তি অসাধারণ ছিল। প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় ইংরাজ কবিগণের উৎকৃষ্ট কবিতা সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার জীবনে দুইটী সখ লক্ষিত হইত। প্রথম লাইব্রেরী, দ্বিতীয় উদ্যান। তাঁহার লাইব্রেরী তৎকালে একটী দেখিবার জিনিষ ছিল।

প্যারীচরণের ন্যায় অক্রোধী, বিনয়ী, সহিষ্ণু, নিরহঙ্কারী ও অমায়িক লোক জগতে বিরল। তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু, ছাত্র, পরিচারক, কর্ম্মচারী সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে "অমন লোক আর হবে না।" তাঁহার মৃত্যুর পর জনৈক ছাত্র সভাস্থলে বলিয়াছিলেন; "আমরা প্যারীবাবুকে বিরক্ত করিবার শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারি নাই।" সত্যের প্রতি তাঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। তৎকালে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। তাঁহার এক পুত্র পরীক্ষার্থীগণের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিতে গিয়া দেখেন

যে তাঁহার ষোল বৎসর পূর্ণ হইতে তিন মাস বাকী। সুতরাং ঐ পত্রে সহি করিলে সত্যের অপলাপ হইবে ভাবিয়া প্রিন্সিপালের বহু অনুরোধ ও নিজ জীবনের অনেক আশা ভঙ্গ করিয়াও বালক উহাতে সহি করে নাই। তিনি পুত্রের এই সত্যপ্রিয়তায় প্রীত হইয়া পুত্রকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেন। তাঁহার দাসদাসীর প্রতি কখনও অবিশ্বাস ছিল না। ইহার জন্য তিনি অনেক সময় প্রবঞ্চিত হইয়াও ঐ স্বভাব ছাড়িতে পারেন নাই। দাস দাসী ও দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্বের পীড়া হইলে তিনি যত্নের সহিত তাহাদের চিকিৎসা করাইতেন ও সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতেন। ভুবন বাবুকে এক বেশ্যার চিকিৎসার্থ ডাকিতে আসিলে তিনি খুল্লতাতের মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "যখন ও ব্যক্তি পীড়িত হ'য়ে প্রাণরক্ষার জন্য তোমার শরণ নিয়েছে, তখন তোমায় যেতে হবে।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ মৃত্যুকালে কিছু অর্থ রাখিয়া যান। তাঁহার পুত্রেরা তাহা জানিতেন না। তিনি তাঁহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষায় যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন এবং তাঁহাকে ঐ সময়ে অনেক অর্থ কষ্টও পাইতে হয়। কিন্তু তথাপিও তিনি উহার কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সাবালক হইলে ঐ অর্থ তাহাদের অর্পণ করেন। তাঁহারা উপার্জ্জনক্ষম অবস্থায় অর্থ দ্বারায় সংসারে সাহায্য করিলে তিনি, কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া কিংবা তাঁহাদের স্ত্রীর অলঙ্কার দিয়া ঐ অর্থ তাঁহাদেরই প্রত্যর্পণ করিতেন।

প্যারীচরণ জননীর সন্তোষার্থ সদাই কায়মনে চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রতিদিন জননীর পাদোদক পান করিতেন এবং বলিতেন, দিবসের মধ্যে বারেকও জননীকে স্মরণ করা উচিত ও আহ্নিক পূজার ন্যায় মাতৃ স্মরণার্থে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকিলে সংসারের নানাকাজে কোন কোন দিন জননীর কথা মনে নাও পড়িতে পারে। কৃষ্ণদাস পাল, কেশব সেন, দ্বারকানাথ মিত্র ইঁহারা প্যারীচরণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। প্যারীচরণের দয়া ও বদান্যতার তুলনা হয় না। তিনি বলিতেন, সকল

লোকেরই নিজ উপার্জ্জিত অর্থের ন্যূনকল্পে এক পঞ্চমাংশ দান করা উচিত। তিনি নিজজীবনেও তাঁহার এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে অল্প বেতনে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন জন্য যথেষ্ট অর্থ কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তখন হইতেই তিনি দরিদ্রগণকে মাসিক অর্থ দান আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ নিমিত্তই তিনি মাসিক তিন চারি সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াও স্ত্রীপুত্রের জন্য সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে মৃত্যুকালে ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। আত্মীয় বন্ধু ও ভদ্র বংশীয় গৃহস্থগণ তাঁহার নিকট হইতে মাসিক ৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত কেহ কেহ একক্রমে ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া পাইয়াছে। কন্যাদায় ও পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত, দরিদ্র স্কুল ছাত্র, অন্ধ, খঞ্জ, অসমর্থ, নিরন্ন জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ভদ্রবংশীয় বিধবা এবম্বিধ বহুব্যক্তিকে তিনি মাসিক বৃত্তি দান করিতেন। এতদর্থে তাঁহার মাসে তিন চারি সহস্র টাকা ব্যয় হইত। এই সকল দান প্রায় গোপনে সমাধা হইত। প্রত্যহ প্রাতে তিনি একটী থলিয়াতে টাকা সিকি, তুয়ানী, পয়সা ও বস্ত্র লইয়া বাহিরে বসিতেন। ছেলেদের পড়ান ও নিজের লেখা চলিত এবং প্রার্থী আসিলেই বালকদিগের দ্বারায় অর্থ প্রেরণ করিতেন। ইহা ব্যতীত প্রতি রবিবারে ভিক্ষুকদের চাউল পয়সা বিতরণের ব্যবস্থা ছিল।

প্যারীচরণ নিজে একেশ্বরবাদী হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তিনি পরিবারস্থ রমণীবর্গের প্রতিমা পূজায় বাধা দেওয়া ভাল মনে করিতেন না। তাঁহার মা ভগিনীর ইচ্ছানুযায়ী বারমাসের তেরপার্ব্বণ সমারোহের সহিত হইত। তিনি নিজেই পূজাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। কেবল পশুবলি তাঁহার নিষিদ্ধ ছিল। তিনি নিজে নিরামিষাশী ও পশু হত্যার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার রচনায় ও বাক্যে ঈশ্বরে বিশ্বাসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রার্থনা করিতেন এবং তাহার ফল নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। ধর্ম্মসাধনার্থ তাঁহার বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। তিনি

পূজাদি অপেক্ষা পরোপকার সাধনকেই ঈশ্বর পূজার উৎকৃষ্ট উপায় বলিতেন।

প্যারীচরণের হৃদয় বড় করুণ ও স্নেহপ্রবণ ছিল। শুনা যায়, তাঁহার মধ্যম পুত্রের ইংলণ্ড গমনকালে তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়াছিলেন এবং তাহার প্রবাস সময়ে তিনি পুত্রের ফটো বুকে রাখিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যু, মধ্যম পুত্রের বিলাতযাত্রা এই সকল কারণে ক্রমশঃ তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে এবং তিনি দুই তিন বৎসর জ্বর ও বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া শয্যাগত হইয়া পড়েন। ইহার পরে তাঁহাব অঙ্গুলীতে একটী ব্রণ হইয়া ঐ ব্রণ ক্ষত পচিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। এই রোগ শয্যায়ও তিনি আশ্চর্য্যরূপ সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। দুর্গোৎসবের ঘটস্থাপনার দিন পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা ও অশিতীপর বৃদ্ধা জননী রাখিয়া তিনি স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন। প্যারীচরণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য ও সদাশয় হইয়াছিলেন।

প্যারীচরণের মৃত্যুতে কলিকাতাবাসীগণ সকলেই দারুণ শোকান্বিত ও বঙ্গসমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার মাত্র স্কুল কলেজ বন্ধ হয় ও সংবাদপত্র সকল তাঁহার জন্য যথেষ্ট শোক প্রকাশ করে। তাঁহার স্মরণার্থ ছাত্রগণ প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সভা করিয়া তাহাতে ছয় শত টাকা উদ্ধৃত করেন এবং ঐ অর্থে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র নির্ম্মিত হইয়া তাহা প্রেসিডেন্সী কলেজের পুস্তকাগারে রক্ষিত হয়। তৎপরে মাদকনিবারণী সভার কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় দেশের ও সমাজের সকলস্তরের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হন। ম্যাক্‌ডোনাল্ড, উড্রো, কৃষ্ণদাস পাল, কেশব সেন, দুর্গামোহন প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাঁহার বিবিধ গুণের কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করেন। প্যারীচরণের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তদীয় ভক্তগণের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর

পার্শ্বস্থ নূতন পথ প্যারীচরণের নামে নামকরণ হইয়াছে। আর কিছু না হউক, কেবল মাত্র প্যারীচরণের পাঠ্যপুস্তকাবলী প্যারীচরণকে চির-পূজ্য ও এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর করিয়া রাখিবে।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপীনামক একটী গণ্ডগ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ কায়স্থকুলে অক্ষয় কুমারেব জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী ছিল। ইঁহারা উভয়েই দয়ালু, পরোপকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বিশেষতঃ ইঁহার মাতা অনন্ত বুদ্ধিমতী, পরহিতৈষিণী ও ন্যায়পরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি গ্রামস্থ ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদাই ঔষধ পথ্যাদি বিতরণ করিতেন। গ্রামে যাহা না মিলিত, তাহা কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিতেন। এই সকল কারণে প্রতিবাসীগণ সকলেই ইঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। অক্ষয়কুমারও পিতা মাতার অনেক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ জীবনের প্রধান সহায় যে তাঁহার পিতা মাতা তাহাতে সন্দেহ নাই।

অক্ষয়কুমার দশ বৎসর বয়সের সময় গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া খিদিরপুরে আইসেন। তৎকালে পার্শী ভাষা প্রচলিত থাকায় আত্মীয়গণেরই ইচ্ছানুক্রমে ইনি পার্শী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইনি পার্শী ছাড়িয়া ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি খুল্লতাত ভ্রাতার বাসায় জয়নাষ্টার নামক একটী লোকের নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন, তৎপরে ওরিএণ্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ইঁহার ইংরাজী শিক্ষার স্বল্পতাহেতু গৌরমোহন আঢ্য

ইহাকে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতে চাহিলে, ইনি পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠের জন্য জিদ করায় আঢ্য বলিয়া উঠিলেন, "সে কি ? তুমি ইংরাজী ব্যাকরণ কিছুই জান না, ইংরাজী উচ্চারণ অবধি করিতে পার না, তোমাকে কিরূপে ঐ শ্রেণীতে দিব ?" কিন্তু পরে অক্ষয় কুমারের অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া তিনি পঞ্চম শ্রেণীতেই ভর্ত্তি করিলেন। কিন্তু ৬।৭ মাস মাত্র উক্ত শ্রেণীতে পড়িয়া পারিতোষিক বিতরণের সময় অক্ষয় কুমার দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। গৌরমোহন তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে একবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে তাঁহার রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বিনা সাহায্যে বাটীতে "বর্জ্জিল" ও স্কুল শিক্ষকের নিকট "ইলিয়ড" কাব্য পড়িতেন। অক্ষয় কুমার প্রত্যহ হাঁটিয়া খিদিরপুর হইতে বিদ্যালয়ে যাইতেন। আসিয়া ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইত, কিন্তু জলখাবার মিলিত না। রামচাঁদ ফিরিওয়ালা রোজ ঐ বাসায় আসিত, একদিন অক্ষয়কুমার রামচাঁদকে বলিলেন "তুমি রোজ আমাকে জলখাবার দিও, আমার কাজ হইলে স্বদসমেত তোমাকে একবারেই পরিশোধ করিয়া দিব।" রামবাবু উপর হইতে ঐ কথা শুনিয়া রামচাঁদকে বলিলেন, "তুমি রোজ অক্ষয়কে এক পয়সার জলখাবার দিও"। জলখাবার খাইবার সময় অনেক কাক আসিত, তিনি কাকগুলিকেও কিছু দিতেন, আপনিও খাইতেন। চিরদিনই তাঁহার এই অভ্যাস ছিল। এই সময়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন হয়। তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া হিন্দু পুরাণাদি অনেকাংশে মনঃকল্পিত বলিয়া স্থির করেন এবং জগতের কার্য্যকারণ পর্য্যালোচনা দ্বারা যে ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। এই বিদ্যালয়ে আসিয়া সহস্র অর্থকষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি যেরূপ আনন্দ মনে বিদ্যোপার্জ্জনার্থ অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন, তাহা সাধারণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালীন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং অক্ষয় কুমারের উপর সাংসারিক ভার পড়ায় তাঁহাকে অর্থ চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং তিনি ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্কুল ত্যাগ করিলেন। একদিকে তাঁহার সংসারের দুরবস্থা, অপরদিকে তাঁহার দুর্দ্দমনীয় জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি স্কুল ত্যাগ করিয়া পুনরায় অর্থ চিন্তা ও বিদ্যোন্নতির জন্য অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষার অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ইনি ইংরাজী স্কুলে আড়াই বৎসর মাত্র পড়িয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত বিজ্ঞানপ্রিয় ছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক দেখিলেই তাহা অতি মনোযোগসহকারে পাঠ করিতেন। ইনি স্কুলে পাঠকালে জ্যামিতির চারি অধ্যায় ও সমগ্র পাটীগণিত পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে এক বৎসরের মধ্যে জ্যামিতির অবশিষ্টাংশ, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কণিক সেক্সন্ ও ডিফারেন্শিয়াল ক্যালকিউলস্ প্রভৃতি দুর্ব্বোধ গণিত শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ সকল শিখিয়া ফেলিলেন এবং জ্যোতিষ, যন্ত্রবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, তদ্ভিন্ন ফ্রেনলজি প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল ও শারীরবিধানাদি নানাপ্রকার বিদ্যাবিষয়ক নানাপুস্তক এবং ইংরাজী সাহিত্যগ্রন্থসমূহ গৃহেই পড়িতে লাগিলেন। ইহাদিগের বাসায় এক ব্যক্তি পুস্তক বিক্রয় করিত, পরে শুনিলেন যে ঐ লোক শোভাবাজার রাজবাটীর রাজা রাধাকান্ত দেবের চাকর, চুরি করিয়া পুস্তক বিক্রয় করে। ইহা শুনিয়া তিনি রাজবাটীতে সংবাদ দেন, কিন্তু রাজবাটীর কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। ইহার অনেক দিন পরে ঐ গ্রন্থ চুরির বিষয় জানিতে পারিয়া রাজবাটীর লোকেরা সন্দেহ করিয়া একজন নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে রুদ্ধ করে। অক্ষয়কুমার তাহা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে চাকরের পুস্তক চুরির কথা সব বলিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু রাজভাগিনেয় আনন্দকে ঐ কথা বলেন। একদিন আনন্দ

অক্ষয়কুমারের বাসায় বসিয়া আছেন, সেই সময় ঐ পুস্তক বিক্রেতা মূল্যের জন্য আসে। তখন অক্ষয়বাবু সমুদয় পুস্তকগুলি আনন্দের হাতে দিলেন। রাজবাটীর সকলের যে যে পুস্তক হারাইয়াছে জানিতেন, তদতিরিক্ত অনেক গ্রন্থ পাইয়া আনন্দ আশ্চর্য্য হইলেন এবং পুস্তকার্পণকারীর ন্যায়-পরতা ও উদারতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আনন্দের গমনকালে অক্ষয়বাবু বলিয়া দিলেন, "আপনারা উহাকে অন্যরূপে শাসন করিয়া নিষ্কৃতি দিবেন, পুলিসে পাঠাইবেন না। পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি পাইল ভাবিয়া অক্ষয় কুমারের আনন্দের সীমা র'হল না।

অক্ষয় বাবুকে যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অসময়ে বিদ্যালয় ছাড়িতে হইয়াছিল,তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁহাকে কেরাণী গিরি, কেহ ব্যবসায়, কেহ বা আইন পাঠ ইত্যাদি নানাজনে নানা অর্থকরী বিদ্যা ও কার্য্যাদি শিখিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "যে নিয়ম নিত্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহা শিখিয়া আমার কি ফল হইবে ? আমি জগতের অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করিতে চাই। তদ্দ্বারা আমার নিজের ও অপর সাধারণের হিতসাধন হইতে পারিবে। যাহাতে নিজের জ্ঞানোন্নতি ও সাধারণের হিত না হয়, এমন কোন বিষয় শিখিয়া ও তাহা লইয়া আমি জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব না।"

তৎপরে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত পরিচিত হইয়া সংবাদ প্রভাকরে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখেন। আর একদিন তত্ত্ববোধিনী সভা দেখিতে যাইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সহিত পরিচিত হন এবং সেই দিন হইতেই উক্ত সভার সভ্য হন। ১৭৬২ শকে এই সভা কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয় এবং অক্ষয়বাবু উক্ত পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। প্রথম মাসে ৮৲, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে ১০৲, পরে ১৪৲ টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উল্লিখিত দুই বিদ্যাশিক্ষোপযোগী কোন পুস্তক না থাকায় তিনি একখানি

ভূগোল প্রস্তুত করেন। ১৮৪২ খৃঃ অঃ তিনি প্রসন্নকুমার ঘোষের সহিত একত্রে "বিদ্যাদর্শন" নামক একখানি জ্ঞানগর্ভ মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু পত্রিকা ছয় মাস পরেই বন্ধ হইয়া যায়। অক্ষয় কুমারকে মফঃস্বলে ভাল ভাল কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য অনেকেই অনেকবার পীড়াপিড়ী করিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার উত্তম উত্তম পুস্তকের অভাব, বিদ্যোন্নতি এবং দেশহিতকর কার্য্যের প্রতিবন্ধক ঘটিবে জানিয়া তিনি নিরতিশয় অর্থকষ্ট সত্বেও কোন স্থানে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল এবং অক্ষয়বাবু তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বহুবিধ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল লিখিয়া তত্ত্ববোধিনীকে অক্ষয়বাবু একটী অমূল্য রত্নভাণ্ডার করিয়া তুলিলেন। এই পত্রিকার উন্নতির জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংখ্যা পড়িয়া রামগোপাল ঘোষ রামতনু লাহিড়ীকে বিস্মিত হইয়া বলেন, "রামতনু, রামতনু, বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ ?—এই দেখ।" তত্ত্ববোধিনীর প্রতি তাঁহার এরূপ আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন ছিল যে ইহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ ও অবনতির আশঙ্কায় একবার ৬০৲ টাকার স্থলে দেড় শত টাকার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য তাঁহাকে অযাচিত ভাবে দিতে আসিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরে তাঁহাকে একটি ঘটনায় বাধ্য হইয়া নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। তাঁহার সম্পাদকতায় তৎকালে তত্ত্ববোধিনী এরূপ গৌরবান্বিত পত্রিকা হইয়াছিল যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উক্ত পত্রিকার অপেক্ষায় প্রতিমাসের শেষে নিতান্ত উন্মুক্ত ও ব্যগ্র হইয়া থাকিত। সুধীরঞ্জনে ইংরাজী ও বঙ্গভাষার যে সুন্দর কথোপকথন আছে, তাহাতে বঙ্গভাষা গর্ব্ব করিয়া কহিতেছেন,

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয়কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥

নিজের জ্ঞানোপার্জ্জন ও অপরকে জ্ঞান বিতরণ করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহার এই ইচ্ছা অনেক পুরণ হইতেছিল। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির অধিকাংশ প্রথমতঃ তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও হৃদয়গ্রাহিতার বিষয় আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই সময় ইংরাজ ও জর্ম্মেণ জাতীয় বহুব্যক্তি তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতেন। একদিন জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের রেভারেণ্ড জন্ ঐ পত্রিকার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া ছাত্রগণকে বলেন, "অক্ষয়কুমার ইউরোপীয়, বিজ্ঞানকে ভারতবর্ষীয় করিয়া তুলিতেছেন।" তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে অনেক কুসংস্কার বর্জ্জনে চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন। ইহার নিমিত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির সহিত অনেক তর্ক ও বিচার করিতে হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার ১৭৬৫ শকের ভাদ্রমাসে তত্ত্ববোধিনীর কার্য্যে ব্রতী হইয়া ১৭৭৭ শকের আষাঢ় মাসে উৎকট শিরোরোগ বশতঃ একবারে অসমর্থ হইয়া পড়েন। ব্রাহ্ম মতের উন্নতিসাধন, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি ইত্যাদি যাহা কিছু কার্য্য ঐ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই কার্য্যগুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয় বাবুর দ্বাদশবার্ষিকী মহতী ক্রিয়া বলিয়া খোদিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

তৎকালে তাঁহার "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থ পড়িয়া অনেকে আমিষ ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হন এবং অনেক দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি সচ্চরিত্র হইয়াছেন। ইহার ধর্ম্মনীতি প্রচারে হিন্দুসমাজকে বহু আন্দোলিত করিয়াছিল। ইনি প্রকাশ্য রূপে বহুবিবাহ

ও বাল্যবিবাহের অবৈধতা, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা দেশীয়ের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক প্রকার কুসংস্কার দূরীভূত করিয়াছেন। "উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথমভাগ" যেরূপ উৎকট শিরোরোগ লইয়া প্রণীত করেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ বিষয় তিনি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"শরীরের যে কি প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এ প্রকার হইল তাহা কি বলিব? অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাব সম্বলিত চিন্তা প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। যতক্ষণ না সে সকল লিপিবদ্ধ করা হয়, ততক্ষণ মস্তক মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কেহ নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ না থাকিলে যান-বাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধুসমীপে যাইয়া লিখিতে অনুরোধ করি। কখন কখন নিতান্ত অযোগ্য লোক দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রাত্রে নিদ্রা হইত না। এইরূপ করিয়া কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটী শব্দমাত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে।"

কোন দেশের কোন পণ্ডিত এরূপ উৎকট মস্তিষ্ক রোগ লইয়া মস্তিষ্কের চালনা করিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা কেহ কখন কোন পুস্তকে পড়ে নাই কিম্বা শুনে নাই। ১২৬২ সালে আষাঢ় মাসে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ গৃহে দুই দিন দুই স্থানে শিরোরোগে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু অক্ষয়কুমারকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার জন্যই তিনি তত্ত্ববোধিনীর ভার লইয়াছিলেন। যে মাসে অক্ষয়বাবু তাঁহার হৃদয়ের শোণিত তুল্য তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব ত্যাগ করিলেন, তাহার অল্প

দিনের মধ্যেই দেখা গেল, সাত শত গ্রাহকের মধ্যে দুই শত মাত্র তত্ত্ব-বোধিনীর গ্রাহক আছে। তাঁহার রচিত প্রায় পুস্তকগুলিই তৎকালে অতি সমাদরের সহিত স্কুলপাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতির নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে অক্ষয়কুমারের ন্যায় একজন অসাধারণ মনস্বী, শ্রেষ্ঠ লেখককে জীবন সত্ত্বেও জীবন্মৃত অবস্থায় দেখিতে হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার শিরোরোগাক্রান্ত না হইলে বঙ্গদেশের ও বঙ্গ ভাষার আরও যে কত উন্নতি হইত, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।

তিনি পীড়িতাবস্থায় প্রায়ই পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বালীগ্রামে বাস করেন। এই বাটীতে তিনি একটী বাড়ী ও তাহার প্রাঙ্গনে একটী ক্ষুদ্র সুন্দর পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহশয্যা ও উদ্যান একটী দেখিবার জিনিষ ছিল। ঐ উদ্যান দর্শন করিয়া তাঁহার একটী বন্ধু ঐ উদ্যানের নাম "চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ" দিয়াছিলেন। ইহাতে এত প্রকার বৃক্ষলতা ও গুল্মাদি সংগৃহীত হইয়াছিল যে অনেকে দূর হইতে আসিয়া বৃক্ষাদির নাম জানিয়া যাইতেন। ইহাতে শতাবধ ফুলের গাছ, তদ্ভিন্ন এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি, লোবান, সাগু, তেজপত্র, হরিতকী, কর্পূর, চন্দন, হিঙ্গু, কাবাবচিনি, ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতি নানারূপ বৃক্ষ ছিল। তাঁহার গৃহসজ্জাও শিক্ষার্থী ও বৈজ্ঞানিকগণের প্রীতির আস্পদ। গৃহে সমুদয় জন্তুর অস্থি, চর্ম্ম, নানাবিধ প্রস্তর. প্রবাল, কাচ, তাপমান ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র, বুদ্ধমূর্ত্তি, নানা দেশের তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা, স্ফটিক, কাচসূত্র, লৌহমলে প্রস্তুত কার্পাস, বাঁশের কাগজ, নানাদেশের মানচিত্র, প্রসিদ্ধ দেশী ও বিলাতি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্ত্তি এবংবিধ বহুপ্রকার শিক্ষাপ্রদ গৃহশয্যায় তাঁহার গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। রোগে অসমর্থ হইয়া তিনি ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন নাই বলিয়া একখানি চিত্রপটে হিন্দীতে যে কয়টী কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার বাঙ্গালা এই: "আমার হৃদয়রূপ উদ্যানে অনেকরূপ

সুখ বাসনা ছিল। কিন্তু আমি কথনও মনের আহ্লাদে বৃক্ষচ্ছায়াতেও উপবেশন করি নাই। আমার এই হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইতে পারিল না, এইটী মনস্তাপের বিষয়, কিছুদিনের মধ্যেই আমি ধূলিসার হইতে চলিলাম।"

অক্ষয় বাবুর বাক্যনিষ্ঠা ও কার্য্যনিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে বলেন, বরং ঘড়ির নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব, তথাপি তাঁহার নিয়মের অন্যথা হয় না। যখন তাঁহার লিখিবার শক্তি ছিল না, তখন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের স্মরণার্থ কতকগুলি চিহ্ন করিয়া রাখিতেন এবং ঐ চিহ্ন দেখিয়া কার্য্য করিতেন। রোগের পূর্ব্বে উক্ত বিষয় শ্লেটে লিখিয়া রাখিতেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেন। একদিন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার বালীর বাটীতে যাইয়া একস্থানে দুইটা রজনীগন্ধার পাতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ইহার কিছু গাছ কাহাকেও দিতে হইবে, ভুলিয়া না যাই এজন্য স্মরণার্থ ইহা রাখিয়াছি। আর একদিন ঐরূপ একটি পয়সা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় বলেন, একটী অনাথা স্ত্রী লোককে মাসে মাসে কিছু দিয়া থাকি, কল্য তাহার টাকা পাঠাইবার দিন। পাছে ভুলিয়া যাই সেইজন্য নিদর্শনস্বরূপ পয়সাটী রাখিয়াছি। এইরূপ তাঁহার বাক্যনিষ্ঠা ও কার্য্যনিষ্ঠার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার ক্ষমাগুণও অসাধারণ ছিল। কর্ম্মচারীরা তাঁহার বহুসহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, সে টাকা তাহাদিগের নিকট হইতে অনেকে আদায় করিয়া দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহার এবংবিধ ক্ষমাগুণের কথাও অনেক শুনা গিয়াছে। অক্ষয়কুমার ঋণ দিয়া চক্ষুলজ্জা বশতঃ কখন চাহিতে পারিতেন না। কর্ম্মচারীরা বলিলে বলিতেন, "থাক্, থাক্, ভদ্রলোক, চাহিলে লজ্জিত হইবেন।" তিনি কর্ম্মচারীদের বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখিয়াছিলেন—"যদি দেনা পাওনা হিসাবে আমার কাহারও কাছে কিছু ঋণ থাকে, তাহা হইলে পাওনাদারকে যেন কখনই চাহিতে হয় না। ঠিক মত যেন টাকা শোধ হয়"। তাঁহার

দাতব্যও অনেক ছিল। কিন্তু তিনি কখনও কাহাকে জানাইয়া দান করেন নাই। কোনও একটী ভদ্রলোকের খুব দুরবস্থা হয়; সে লোকটী অতি সুশীল ও নিরাকাঙ্খ ছিল, তিনি তাঁহার দান লইবেন না জানিয়া অক্ষয়বাবু গোপনে তাঁহার নাম বিনা স্বাক্ষরে ঐ লোককে টাকা পাঠান। এইরূপ বালীতে কোন হিতকর কার্য্যের জন্য কোন লোক চাঁদার খাতায় তাঁহার নাম স্বাক্ষঁর করিতে বলে, কিন্তু তিনি নাম স্বাক্ষর করেন নাই; সেই দিনই গোপনে চাঁদাপ্রার্থীর নিকট কর্ম্মচারীকে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দেন। একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলে, "অক্ষয়বাবু, আপনার কাছে যে কয়টী টাকা রাখিয়াছি, তাহা দিতে হইবে।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, যেমন ভাবে কাগজের মোড়কে টাকা ছিল, ঠিক সেই ভাবে তখনই টাকাগুলি তাঁহার হাতে দিলেন। লোকটী ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাঁহার স্মরণশক্তিও আশ্চর্য্যজনক ছিল, তিনি বলিতেন, "রোগে আমার স্মরণ শক্তি হ্রাস হইয়াছে।" এই রোগের সময়ই একদা তাঁহার কর্ম্মচারীকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ হইতে কোন একটী বিষয় বাহির করিতে বলেন, তাহা যে নোটবুকে ছিল তাহাও দেখাইয়া দেন, তথাপি কর্ম্মচারী ঐ বিষয় বাহির করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি ষষ্ঠ পৃষ্ঠা দেখ বলিলেন।" খুলিবা মাত্র পাওয়া গেল। ইহার পরে একব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ঐ বিষয় ঐ পৃষ্ঠায় আছে, আপনি কিরূপে জানিলেন?" তদুত্তরে তিনি বলেন, "শিরোরোগের বহু পূর্ব্বে একবার উহা পড়িয়াছিলাম"। এইরূপে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি যাহা দুই ঘণ্টা খুজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, তিনি তাহা এক সেকেণ্ডে বাহির করিয়া দিতেন। তাঁহার মাতৃভক্তিও আদর্শস্বরূপ ছিল। একবার তিনি দেবেন্দ্র বাবুর সহিত ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে যাওয়া স্থির করেন, তাহাতে তাঁহার মাতার মুখ মলিন দেখিয়া তিনি ভ্রমণে যাওয়া রহিত করিলেন এবং দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"পিতৃ অনুরোধে রাজ্য সুখ বিসর্জ্জন দিয়া

রামচন্দ্র যেমন বনে গিয়াছিলেন, মাতৃক্লেশের জন্য আমাকেও তেমনই এবারের ভ্রমণ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল।"

অক্ষয়বাবু তাঁহার দরমাহাটার বাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে একদিন খগোল যন্ত্র লইয়া গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী আসিয়া বলিলেন,—"এমন লোক কে দেখেছে, দুই প্রহর রাত্রিকালে স্ত্রীর শয্যা ছেড়ে আকাশের দিকে চক্ষু স্থির করে থাকে, এতো সামান্য বিড়ম্বনা নয়।" অক্ষয় বাবু ইহাতে বলিলেন—"এমন লোকের স্ত্রী এরূপ কথা বলে, ইহা আরও বিড়ম্বনা।" সুশিক্ষিতের অশিক্ষিতা পত্নী যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা তিনি নিজ জীবনে পূর্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থের ঐস্থান অত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর জীবনীলেখক তাঁহার জীবনের এবংবিধ বহু উচ্চ আদর্শপূর্ণ ঘটনা অক্ষয় বাবুর পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে জানিয়াছিলেন।

১২৯৩ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ বালীগ্রামে তাঁহার সেই প্রিয় পুষ্পবাটীকায় অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রণীত অনেক পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: চারুপাঠ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার। এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমই তাঁহার অসময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ। তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বগ্রাহী ছিল। কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, সকল বিষয়ই উহা সমভাবে সঞ্চরণ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের শেষাবস্থায় ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল অর্থাৎ শেষাবস্থায় তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ" পড়িলেই তাঁহার এই পরিবর্ত্তনের বিষয় সম্যক্‌ভাবে অনুভব করিতে পারা যায়। কিন্তু অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার যে পথ

দেখাইয়া গিয়াছেন এবং যে সঞ্জীবনী মন্ত্রদানে তাহা সজীব করিয়াছেন, তাহা কোনও কালে লয় পাইবার নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১২২৭ সালে ইংরাজী ১৮২০ খৃঃ ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। যে আচার, আচরণ ও ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া বালকবালিকাগণ সুশিক্ষা লাভ করিয়া উত্তরকালে উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করিতে পারে, এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন জননীগর্ভে, তখন তাঁহার মাতা ঘোর উন্মাদিনী। অনেক ঔষধাদিতেও তিনি আরোগ্য হন নাই। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ভুমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তিনি আরোগ্য হন। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তপাতী জাহানাবাদের নিকট বনমালীপুরে ছিল। ইহার পিতামহের তীর্থপর্য্যটন জন্য দীর্ঘপ্রবাস, অর্থকষ্ট, জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি কারণে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী দুর্গামণি দেবী নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া চারি কন্যা ও একমাত্র পুত্রকে লইয়া বনমালীপুর ত্যাগে বীরসিংহগ্রামে আই-সেন। এখানে আসিয়া প্রথমে পিতৃভবনে কিছু দিন বাস করেন। পরে ঐ গ্রামেই একখানি স্বতন্ত্র কুটীর করিয়া পুত্রকন্যাসহ অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। কিছু দিন পরে পুত্র ঠাকুরদাস জননীর কষ্টে কাতর হইয়া অর্থোপার্জ্জন মানসে কলিকাতায় যান। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার জ্ঞাতিপুত্রের বাসায় আহারাদি করিয়া তাঁহারই টোলে কিছু সংস্কৃত ও একটু ইংরাজী পড়েন; ইহার পরে তিনি অন্য একস্থানে আহারের বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু এই ব্যক্তির দরিদ্রতাবশতঃ অর্দ্ধেক দিন তাঁহার

আহার হইত না। এইরূপ দুঃসহ কষ্টে কিছুদিন কাটাইয়া পরে ২৲ টাকা বেতনের একটী চাকুরী পান। শুনা যায়, এই চাকুরী হওয়ায় তাঁহার পিতৃগৃহে আনন্দোৎসব হইয়াছিল। ঠাকুরদাস বুদ্ধিমান, দৃঢ়চিত্ত ও কার্য্য-কুশল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও ঐ দুইটী টাকা জননীকে পাঠাইতেন। ঠাকুরদাস কলিকাতা আইসাকালে তাঁহার বয়স পঞ্চদশবর্ষমাত্র ছিল। ২৩।২৪ বৎসর বয়সের সময় গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। রূপগুণসম্পন্না অন্নপূর্ণাসদৃশী এই ভগবতী দেবীই ঈশ্বরচন্দ্রের জননী। ভগবতী দেবী দয়া, দাক্ষিণ্য, অতিথিসেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আদর্শ রমণী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রও মাতার এই সকল গুণের অধিকারী হইয়া উত্তর কালে একজন দেশপূজ্য লোক হইতে পারিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের পর হইতে ঠাকুরদাসের সংসারের উন্নতি হওয়ায় তাঁহাকে সকলেই ভালবাসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে বড় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার উৎপাতে বাটীস্থ ও প্রতিবাসীমণ্ডলী সকলেই অস্থির হইয়া উঠিত। পঞ্চমবর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামস্থ পাঠশালার গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রথম পাঠারম্ভ করেন। তাঁহার মেধাশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও শ্রমপটুতা দর্শনে গুরুমহাশয় তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং তাঁহার পাঠানুরক্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় অন্যান্য বালকগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে মুখে মুখে অনেক পাঠ শিখাইতেন। বেশী রাত্রি হইলে তাঁহাকে কোলে করিয়া বাটী রাখিয়া আসিতেন। ৮ বৎসর বয়সে তিনি গ্রাম্য পাঠ সমাপ্ত করিয়া পিতার সহিত কলিকাতায় আইসেন। এই বীরসিংহ হইতে কলিকাতা যাইবার পথে যে সকল মাইলষ্টোন আছে, তাহাই দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা করেন।

কলিকাতায় আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে পিতার সহিত রহিলেন। জগদ্দুর্লভ ঠাকুরদাসকে পিতৃব্য সম্বোধন করিতেন বলিয়া

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দাদা ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে বড় ও ছোট দিদি বলিয়া ডাকিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই সিংহপরিবারে অত্যন্ত আদর যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কনিষ্ঠাভগিনী রাইমণির অত্যধিক স্নেহ ও যত্নের কথা চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল এবং এই দেবী-প্রকৃতি রাইমণির মধুর বাৎসল্যই ঈশ্বরচন্দ্রকে নারী জাতির কল্যাণার্থে চিরদিনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তিন মাস একটী পাঠশালায় পড়েন, তাহার পরে পীড়িত হইয়া বাটী যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া রোগমুক্ত হইলে পুনরায় পিতার সহিত কলিকাতায় আইসাকালীন ঈশ্বর চন্দ্র ক্রমাগত ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি আর হাটিতে পারিব না। এই দেখুন আমার পা ফুলিয়া গিয়াছে।" পিতা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, পরে প্রহার অবধি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর এক পাও নড়াইতে পারিলেন না। অগত্যা ঠাকুর দাস পুত্রকে স্কন্ধে করিয়া বহু কষ্টে বৈদ্যবাটী আসিয়া তাহার পরে নৌকায় কলিকাতায় আসিলেন। তৎপরে পিতার ইচ্ছানুক্রমে নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হইলেন। কালেজে প্রবেশের ছয়মাস পরে যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। তাঁহার মেধা, অধ্যবসায় ও পাঠে মনোযোগ দেখিয়া শিক্ষকগণ সকলেই তাঁহাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। কালেজে পাঠকালে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি দিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে হইত। তাহার একটী ভুল হইলে, কিম্বা কোনও দিন ঘুমাইয়া পড়িলে, পিতার নিকট তাঁহার যথেষ্ট শাস্তিভোগ করিতে হইত। কোন কোন দিন ঠাকুরদাস পুত্রকে এতই প্রহার করিতেন যে বাটীর স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ রাইমণি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতেন ও অন্যত্র বাসা করিতে বলিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য অনেক সময়

চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া যাতনায় অস্থির হইতেন। ঠাকুরদাস শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া মুখে মুখে উদ্ভট কবিতা শিখাইতেন।

ব্যাকরণ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ কালে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স একাদশবর্ষ মাত্র। এই বয়সের অল্পতাহেতু তাঁহাকে সাহিত্য শ্রেণীতে লইতে আপত্তি করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "সাহিত্য বিষয়েই পরীক্ষা করিয়া লইলে ভাল হয়, নতুবা আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে।" সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথম বর্ষে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তর চরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সকল আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া শেষ পরীক্ষায়ও অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি অনর্গল সংস্কৃতে লোকের সহিত অনেক সময় বাক্যালাপ করিতেন। তৎকালের পণ্ডিতগণ তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া বলিতেন; "ঈশ্বর শ্রুতিধর, এ বালক দীর্ঘজীবী হইলে অদ্বিতীয় লোক হইবে।" এই সময় কলিকাতার বাসায় তাঁহাকে প্রতি দিন দুইবেলা রন্ধন, বাজার করা, তরকারী ও মৎস্য কুটা, বাটনা বাটা, বাসন মাজা প্রভৃতি যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে হইত। পিতৃ আদেশানুসারে পাতের পাশে একটীও ভাত ফেলিতে পারিতেন না। ভাতের থালা পরিষ্কার করিয়া খাইতে হইত। অন্যথা বিষম শাস্তি পাইতে হইত। এই সময়ে বীরসিংহে যাইলে শ্রাদ্ধাদির নিমন্ত্রণের শ্লোক ঈশ্বর চন্দ্রকেই রচনা করিয়া দিতে হইত। একবার ঐরূপ শ্লোক রচনা করিয়া দিলে অভ্যাগত পণ্ডিতমণ্ডলী সেই শ্লোকের মনোহারিতা ও চমৎকারিতা দর্শনে এবং তাহাই বালক ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বীরসিংহ ও তৎসন্নিহিত সকল স্থানে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল ও প্রচার হইয়া

গেল যে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঠাকুরদাস ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দীনময়ী দেবীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ দেন। তাহার পরে তিনি সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ সমাধা করিয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে অলঙ্কারের শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অলঙ্কারের শ্রেণীতেও তিনি বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে অনেক বয়ঃজ্যেষ্ঠও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিত না। তিনি বিদ্যালয়ে বরাবরই প্রথম থাকিতেন। লেখা পড়ায় কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিবে ইহা তাঁহার অসহনীয় ছিল। কখনও কাহার অনুগ্রহভাজন হইবার প্রবৃত্তি কেহ তাঁহাতে দেখে নাই। তাঁহাকে সকল সময়ে ও সর্ব্বত্রই আত্ম নর্ভরের গুণে জয়ী হইতে দেখা গিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র যে উত্তরকালে দয়ার প্রতি-মূর্ত্তি হইবেন, তাহা তাঁহার বিদ্যালয়ের শৈশব সঙ্গীদিগের পরিচর্য্যার মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি দরিদ্রের সন্তান, নিজের অন্নের সংস্থান ছিল না, অথচ বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পাইতেন তাহা দিয়া আপনার সহস্র অভাব সত্ত্বেও সহপাঠীগণের অভাব দূর করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীল ছিলেন। আপনি গৃহনির্ম্মিত মোটা চটের মত কাপড় পরিয়া অন্য বালককে ভদ্রোচিত বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। নিজে গামোছা পরিয়া অনেক সময় বস্ত্রপ্রার্থীকে আপন কাপড় খুলিয়া দিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই সহপাঠী কিম্বা অপর কাহারও রোগ শুনিলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন; সমুদয় গৃহকর্ম্ম নিজহস্তে সম্পন্ন করিতেন, এ সকল সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে সকলের প্রথম থাকিতেন। অনেক সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া লেখা পড়া করিয়া রোগে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও কখন পরিশ্রমে তিনি বিরত ছিলেন না। এই সকল গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে একটী দোষ (অথবা এটী গুণ) একগুঁয়ে স্বভাব (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ)

চিরদিন সমভাবে প্রবল ছিল। শৈশবে স্নানের দিনে ঠাকুরদাস যদি বলিতেন, "ঈশ্বর, আজ তোমার স্নান করা হইবে না" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতেন, "না বাবা, আজই স্নান করিতে হইবে, আজই স্নান করিব," আবার কোন দিন তৈলমাখা হইয়াছে এবং পিতা স্নান করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু পাছে পিতার মতে মত দিতে হয় এজন্য এমনই বেঁকিয়া বসিয়াছেন যে প্রহার করিয়াও তাঁহাকে ডুব দেওয়াইতে পারেন নাই। এইরূপে প্রত্যেক বিষয়েই কি ছাত্রজীবনে, কি কর্ম্মজীবনে চিরদিনই সকল সময়েই নিজের জিদ বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ ও পিতৃমাতৃভক্তি অতি আদর্শনীয় ছিল। কলিকাতায় বাসকালে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুকে একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি বাজারে পাঠান, কিন্তু রাত্রি দশটার সময়ও ভ্রাতা বাটী আসিল না দেখিয়া তিনি ভ্রাতার জন্য উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পরে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখেন যে নূতন বাজারে ভ্রাতা এক দেওয়াল ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে। এবংবিধ তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি অত্যধিক স্নেহ ও অগাধ পিতৃমাতৃভক্তির ভূরী ভূরী প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বাল্য হইতেই প্রতিমা পূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন ; "সংসারে পিতা মাতাই জীবন্ত দেবতা, তাঁহাদের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদিগকে কষ্ট দিলে ধর্ম্ম হয় না।" তিনি আজীবন পিতামাতার সুখের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন ও সেবার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। শুনা যায়, পাঠ্যাবস্থায় একদিন আহারের সময় ব্যঞ্জনে একটী তেলাপোকা পাইয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ও অন্যান্য লোকদিগের আহার নষ্টের আশঙ্কায় অক্লেশে তেলাপোকাটী গিলিয়া ফেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠকালে কালেজের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া স্মৃতি পড়িতে লাগিলেন। যে সকল দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ ছাত্রগণ ক্রমান্বয়ে

দুইবৎসর পড়িয়াও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তিনি সেই সকল গ্রন্থ অক্লান্ত পরিশ্রমে ছয় মাসেই আয়ত্ত করিয়া বিশেষ পারদর্শীতার সহিত ল-কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অন্যান্য পরীক্ষা শেষ করিয়া উনবিংশ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে উৎকৃষ্ট গদ্য লিখিয়া তিনি এক শত টাকা পুরস্কার ও পদ্য রচনা করিয়া আর একটী পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পরে তিনি ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীতে প্রবেশ করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক শত টাকা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্য রচনার জন্য আর এক শত টাকা পান। বেদান্ত শ্রেণীতে পাঠকালে অধ্যাপক বৃদ্ধ শম্ভূচন্দ্র বাচস্পতিকে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদাই সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তিনি ব্যাধি বশতঃ এমন কি নিজের শৌচাদিও নিজে করিতে পারিতেন না, ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্য লইতে হইত। এই সকল কারণে বাচস্পতি ঈশ্বরকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং প্রায় কোন কার্য্যই ঈশ্বরচন্দ্রের অমতে করিতেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বাচস্পতি ঈশ্বরচন্দ্রের বারম্বার নিষেধ সত্বেও সেই রুগ্ন ও বৃদ্ধাবস্থায় একটী সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিলেন এবং একদিন তাঁহার সেই বালিকা পত্নীকে দেখাইবার জন্য ছাত্র ঈশ্বরকে বলপূর্ব্বক নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার গুরুর এই অসঙ্গত আচরণে এবং এই মাতৃস্থানীয়া বালিকাকে দেখিয়া ও তাহার ভবিষ্যৎচিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। জল খাইতে বলিলে "এ ভিটায় আর জলস্পর্শ করিব না" বলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে ইহার অল্পদিন পরেই বৃদ্ধ বাচস্পতি পরলোকগমন করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র জীবনেই তাঁহার পরদুঃখকাতর দয়ালু হৃদয়ে বালবৈধব্যের নিদারুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল এবং তিনি উত্তরকালে যে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সমগ্র বঙ্গসমাজ কম্পিত করিয়াছিলেন, বোধ হয় এই বৃদ্ধ বাচস্পতির বালিকা পত্নীর অকালবৈধব্য দর্শনেই তাহার প্রথম অঙ্কুর হইয়াছিল।

ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীতে পাঠকালে দুই মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদশূন্য হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি দুই মাসের বেতন ৮০৲ টাকা পাইয়া পিতার হাতে দিয়া বলিলেন; "এই অর্থে আপনি তীর্থপর্যাটনে গমন করুন।" তাহার পরে ঠাকুরদাস তীর্থ হইতে আসিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া এক শত টাকা, উৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্য এক শত, আইন পরীক্ষার পুরস্কার ২৫৲ ও উত্তম হস্তাক্ষরের পুরস্কার ৮৲, সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৩৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার হাতে এই টাকা দিয়া ঋণ শোধ করিতে বলিলেন। অধ্যাপকগণ সকলে মিলিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রশংসা পত্র প্রদান করিলেন এবং একবিংশতি বর্ষীয় যুবককে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ১৮২৯ খৃঃ ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৪১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে মার্সেল সাহেবের অধীনে পঞ্চাশ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর প্রথম চাকুরী আরম্ভ করেন। চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দী ও ইংরাজী শিক্ষক রাখিয়া উক্ত দুই ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে পিতাকে কর্ম্ম হইতে অবসর লওয়াইলেন। ঐ সময় তাঁহার বেতন দশ টাকা মাত্র ছিল। তিনি পিতাকে মাসের প্রথমেই ২০৲ টাকা পাঠাইয়া বাকী ৩০৲ টাকায় আপনাদের বাসা খরচ চালাইতেন। ঐ টাকায় আপনারা তিন ভ্রাতা, খুল্লতাত ভ্রাতা দুইটী, পিশতুতো ও মাসতুতো ভ্রাতৃত্রয়, একটী ভৃত্য এই নয়টী লোকের প্রতিপালন হইত। তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবু এই সময়ে তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিখিতে চাহেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুকে দুর্ব্বোধ্য ও বহুকালব্যাপী মুগ্ধবোধ পড়াইবার

পরিবর্ত্তে অল্পদিন ও অল্পায়াস সাধ্য কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা, এই চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন; "তোমাকে একটা সহজ উপায়ে সংস্কৃত শিখাইতে হইবে" এই বলিয়া সে দিন তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরদিন তিনি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এক রাত্রেই উপক্রমণিকা রচনা করিয়াছেন। এই সময় হইতে তাঁহার আলাপী অনেক লোক তাঁহার কাছে সংস্কৃত শিক্ষার্থ আসিতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠীগণের মধ্যে মদন তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি যে সমুদয় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, তর্কালঙ্কার সাগ্রহে তাহাতে যোগ দিতেন। ময়েট সাহেব একটী ৮০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে দিতে বলেন, কিন্তু ঐ সময় বাচস্পতি মহাশয় কালনায় ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইবার আর সময় নাই, দুই দিনের মধ্যেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র কালনায় যাত্রা করিলেন এবং একরাত্র ও একবেলা হাঁটিয়া কালনায় উপস্থিত হইয়া বাচস্পতি মহাশয়কে সংবাদ দিলেন। কোন এক সময়ে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী বাটী যাইতে বলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি ছুটী না পাওয়ায় তাঁহার বাটী যাওয়া হইল না। ইহাতে তিনি মনে দারুণ কষ্ট পাইলেন। তৎপরে বিবাহের পূর্ব্বদিন তিনি সাহেবকে বলিলেন; "সাহেব আমার মাতৃআজ্ঞা, আমাকে বিদায় দিতেই হইবে, নচেৎ আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিব।" তখন সাহেব ছুটী দিলেন। ঐ সময় বর্ষাকাল, ভরা দামোদর, ঘাটে একখানিও নৌকা নাই। এদিকে আর সময়ও নাই, মাতৃআজ্ঞা যেমন করিয়া হউক বিবাহ দিনে বাটী পৌছাইতেই হইবে। তখন তিনি দামোদর নদী সাঁতরাইয়া নিরাপদে ও পারে গেলেন এবং অপরাহ্নে দারকেশ্বরের নদও পূর্ব্ববৎ পার হইয়া বিবাহ রাত্রে বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

তৎপরে সংস্কৃত কালেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে ১৮৪৬

খ্যঃ বিদ্যাসাগর উক্ত পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কালেজে পূর্ব্বে শিক্ষক ও ছাত্রগণের আসা যাওয়ার কোন একটা সময়ের বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। তিনিই ছাত্র ও অধ্যাপকগণের কালেজে যাওয়া আইসার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পাঠ্যপুস্তকাদি নির্দ্দিষ্ট, এবংবিধ নানাপ্রকার রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি সংস্কৃত কালেজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম সকল অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সময়ে একদিন বিদ্যাসাগর কার্য্যোপলক্ষে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কার সাহেব টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া অর্দ্ধ শয়ানাবস্থায় চেয়ারে বসিয়া সমাগত বিদ্যাসাগরকে বিনা অভ্যর্থনায় দাঁড় করাইয়া রাখেন। তিনি কার সাহেবের এই ব্যবহার বিস্মৃত হন নাই। ইহার কয়েক দিন পরে কার সাহেব একদিন কালেজে বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, বিদ্যাসাগর তাঁহার চটী জুতা সমেত পদদ্বয় টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া চেয়ারে অর্দ্ধ শয়ানাবস্থায় থাকিয়া সাহেবের অভ্যর্থনা করিয়া প্রতিশোধ লন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অপর জাতি শিক্ষালাভ করিতে পাইত না। বিদ্যাসাগর বহুচেষ্টা ও শাস্ত্রান্বেষণ করিয়া শূদ্রাদি সকল জাতিকেই সংস্কৃত শিক্ষায় অধিকার দেন। সেই অবধি সংস্কৃত কালেজে উচ্চনীচ সর্ব্বজাতির প্রবেশ ও শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। কলিকাতার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিরতিশয় কষ্ট দর্শনে ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষাসমাজকে অনুরোধ করিয়া দুইমাস গ্রীষ্মাবকাশ মঞ্জুর করান। তদবধি বঙ্গের সর্ব্বত্র ঐ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহার গুণে কি বড়, কি ছোট সকলেই তাঁহার বশীভূত ছিল। তিনি একবার হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধে চোগা চাপকান পরিয়া তিনদিন ছোট লাটের সহিত দেখা করেন, চতুর্থ দিন সাহেবকে বলিলেন, "এই

তোমার সহিত আমার শেষ দেখা।" সাহেব চমকিত হইয়া বলিলেন; "কেন পণ্ডিত, কি হইয়াছে?" বিদ্যাসাগর হাসিয়া বলিলেন; "কয়েদীর মত পোষাক পরিয়া সং সাজিয়া আপনার সহিত দেখা করা আমার পক্ষে অসম্ভব, ইহা আমার দ্বারা হইবে না।" প্রত্যুত্তরে সাহেব বলিলেন; "পণ্ডিত, যে পোষাকে আসিলে আপনার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন।" ইহার পর চটী জুতা, থান ধুতি ও মোটা মার্কিনের চাদর তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

এই সময়ে তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবের সহিত কোনও বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি অম্লানবদনে পাঁচ শত টাকা বেতনের চাকুরীটি পরিত্যাগ করিলেন। এই কার্য্যত্যাগ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও বন্ধু তাঁহাকে কিছু বলায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি টাকা অপেক্ষা পদমর্য্যাদা অপেক্ষা সম্ভ্রমই বহু মূল্যবান মনে করি, যে কার্য্যে সম্ভ্রমের অপচয় হয়, আমি সে কাজ করিতে চাইনা।" এই কার্য্য পুনঃ গ্রহণ জন্য তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষ ময়েট সাহেব ও তাঁহার বাঙ্গালী এবং ইংরাজবন্ধুগণ তাঁহাকে বহু অনুরোধ, সাধ্য সাধনা ও অনেক চেষ্টা করিয়াও পুনরায় ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার পদত্যাগ পত্রে লিখিয়াছিলেন:—"আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময় সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিব এবং সেই ব্রত জীবনের শেষ দিনে আমার চিতাভস্মে উদযাপিত হইবে।" ঈশ্বরচন্দ্রের প্রণীত প্রথম পুস্তক বাসুদেব চরিত, তাহার পরে ১৮৪৭ খৃঃ বেতাল পঞ্চবিংশতির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহাই তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক সকলের আদি গ্রন্থ। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শকুন্তলা এবং এই বৎসরেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক" রচনা করেন। ১৮৫৬ খৃঃ দুই ভাগ বর্ণ পরিচয়, কথামালা, ১৮৬২ খৃঃ সীতার বনবাস, ১৮৬৪ খৃঃ আখ্যানমঞ্জরী, ১৮৬৯ খৃঃ ব্যাকরণ কৌমুদী, ১৮৭০ খৃঃ সটিক মেঘদূত ও ভ্রান্তিবিলাস রচনা করেন। কুলীন কন্যাদিগের অসহনীয়

যন্ত্রণাদর্শনে কাতর হইয়া তিনি বহু বিবাহ নিবারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বহু বিবাহ পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন বিদ্যার্থী বালকগণের শিক্ষার সুবিধার্থে তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকাশিত সর্ব্বশুদ্ধ ৫২ খানি গ্রন্থ। ইহার প্রায় সকল গ্রন্থই বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর স্কুল দর্শনার্থ বাহির হইয়া পথে পালকীতে বসিয়া বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা এরূপ কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য ছিল যে পড়িতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের জন্যই আজ বাঙ্গালা ভাষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তকাগার একটী দেখিবার জিনিষ ছিল। তিনি ইংরাজী সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া সেগুলি উত্তমরূপে বাঁধাইয়া পুস্তকাগারে রাখিতেন। কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পুস্তকাগার দেখিতে আসিয়া তাঁহার পুস্তকগুলি দেখিয়া বলিয়াছিলেন; "এরূপ বহু ব্যয়ে পুস্তকগুলি বাঁধান কি ভাল? ঐ টাকায় অনেকের উপকার হইতে পারিত।" ইহার কিছু ক্ষণ পরে অন্যান্য কথার পর বিদ্যাসাগর ঐ বাবুর মূল্যবান সালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন; আপনার এ শালের মূল্য? বাবু বলিলেন, পাঁচ শত টাকা। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন; "পাঁচসিকার কম্বলেও ত শীত ভাঙ্গে, তবে এত টাকার শালে প্রয়োজন কি?" বাবুটী লজ্জায় অধোবদন হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ্ বেথুন সাহেব যে সময়ে বঙ্গনারীগণের সুশিক্ষা সাধনে জীবন মন সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাতে থাকিয়া নারীসুহৃৎ বিদ্যাসাগরও মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। এই কার্য্যে যোগ দিতে গিয়া সে সময়ে যাঁহারা সমাজে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ ইঁহাদিগের নামই

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেথুনের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর একদিন বেথুন স্কুল দেখিয়া আসিয়া কোনও বন্ধুর নিকট "এতগুলি মেয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছে, কিন্তু যে ইহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল সে দেখিল না" বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুল লইয়া বিদ্যাসাগর যখন বিপন্ন হন, তখন লেডী ক্যানিং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইহার স্থায়িত্বের জন্য অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহাকে প্রায় সময়ই স্কুল পরিদর্শনার্থ নানাস্থানে যাইতে হইত। একবার তিনি মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত বগীগাড়ী করিয়া উত্তরপাড়ার স্কুল পরিদর্শনার্থ যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়া যান। সেইবার যকৃতে যে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগে, তাহা আর সারে নাই। তিনি সেই সময়ের মিস্ কার্পেণ্টারের সেবার কথা এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—"যখন আমার চেতনা হইল, আমার বোধ হইল যেন আমার মা আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন, আর স্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। সশরীরে সেই একবার স্বর্গভোগ করিয়াছিলাম।"

১৮৫৩ খৃঃ বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ গ্রন্থ প্রচার করেন। ঐ গ্রন্থ প্রচার মাত্র ভারতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। এরূপ ভয়ঙ্কর আন্দোলন হইয়াছিল, যে সেরূপ ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই ঐ আলোচনা, ঐ কথা। এমন কি তৎকালে বিদ্যাসাগরের উপর সর্ব্বসাধারণের এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে অনেকে গোপনে তাঁহার প্রাণ বধেরও চেষ্টা করিয়াছিল। কত পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ মিথ্যা প্রচার করিবার জন্য কত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, কত প্রতিবাদ আসিল, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্যাসাগর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ সকল বিপক্ষদিগের কূট

তর্কের মীমাংসা করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ দ্বিতীয়বার বৃহদাকারে বিধবাবিবাহ গ্রন্থ প্রচার করেন। শুনা যায়, এই সময়ে তিনি একবার মাত্র দ্বিপ্রহরে তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুর গৃহে আহার করিতে আসিতেন। কালেজের কার্য্য শেষে অপরাহ্ণ হইতে সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাগারে সেই পুস্তকরাশির মধ্যে বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে তাঁহার বহুদিন কাটিয়াছে। শাস্ত্রালোচনায় এইরূপ নিয়ত নিযুক্ত থাকার সময় একদিন রাত্রিশেষে একটা বিষয়ে শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি নির্ণয় করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় যাইতেছিলেন, পথে সহসা শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং পুনরায় কালেজে ফিরিয়া আসিয়া শ্লোকার্থ লিখিতে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। ইহার পরে প্রায় ২৫ সহস্র লোকের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খৃঃ ২৬ জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইল এবং ১২৬৩ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ সর্ব্বপ্রথম বিধবাবিবাহ আরম্ভ হয়। বিদ্যাসাগর প্রায় তিন চারি শত বালবিধবার বিবাহ দেন। বিধবাবিবাহের পক্ষসমর্থন, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা ও বিবাহ দেওয়া তাঁহার মহাব্রত, সেই ব্রত পালন ও উদযাপনে তিনি তাঁহার অমূল্য সময় ও শরীর ক্ষয় করিয়াছেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শেষে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, কিন্তু তত্রাচ তাঁহাকে ঐ সকল কারণে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও দুঃখিত কিম্বা চিন্তিত হইতে দেখা যায় নাই।

বিধবাবিবাহের আইন পাশের সময়েই বিদ্যাসাগর কুলীনগণের অনুষ্ঠিত বহু বিবাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। এই বহু বিবাহে দেশের যে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর তাঁহার রচিত বহু বিবাহ বিষয়ক বহু বিস্তৃত গ্রন্থে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তিনি যে কেবল বিধবা বিবাহের প্রচলন ও বহু বিবাহের নিবারণ চেষ্টা করিয়াই

ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজ গ্রাম বীরসিংহে একটী ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, শ্রমজীবী, রাখাল ও কৃষক বালকগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ঐ সকল বিদ্যালয় অবৈতনিক। সকলেই বিনাব্যয়ে লেখাপড়া শিখিতে পাইত। কাগজ, কলম, শ্লেট, পেন্সিল, পুস্তক, শিক্ষকদিগের বেতন প্রভৃতিতে মাসে তাঁহার তিন শত টাকার অধিক ব্যয় হইত। এই বিদ্যালয় তাঁহার জননী ভগবতী দেবীর নামে পরিচিত। দরিদ্র ছাত্রগণ বিদ্যাসাগরের গৃহে পরম যত্নে প্রতিপালিত হইত। পিতা ঠাকুরদাস গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। জননী অন্নপূর্ণা বেশে রন্ধন করিয়া সস্নেহে সকলকে ভোজন করাইতেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণ চন্দ্র গৌরব ভরে বলিতেন, "দুইবেলা বহুসংখ্যক দরিদ্র বালকের সহিত সামান্য অন্ন ব্যঞ্জনে উদরপূর্ণ করিয়া পরম সুখে ঠাকুর দাদার ক্রোড়ে নিদ্রা গিয়াছি।" বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যারম্ভের দিন মজুর না পাওয়ায় বিদ্যাসাগর নিজে সহোদরগণ সঙ্গে মৃত্তিকা খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। বীরসিংহ গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের অভাব বশতঃ তিনি উৎকৃষ্ট স্কুলছাত্রগণকে নিজব্যয়ে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইয়া বীরসিংহ অঞ্চলের এই অভাব মোচন করেন। বিদ্যাসাগর নিজের পরিবার অপেক্ষা অপর দশ জনের সেবাই অধিক করিয়াছেন। তাই তিনি বাটী আসিলে স্বীয় পরিবার অপেক্ষা প্রতিবাসী ও বিপন্ন গ্রাম্য লোকদিগেরই অধিক আনন্দ হইত। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানে নূতন কাপড়, চক্‌চকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, পয়সা সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত। দীন দরিদ্রের অভাব মোচনে সকল সময়েই তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁহার চাঁদার খাতায় একবার যাহার নাম উঠিত, পূজার কাপড় ইত্যাদি একবারে তাহার বাঁধা হইয়া যাইত। তাঁহার জননীও পুত্রের ন্যায় পরের দুঃখ মোচনে সদাই ব্যস্ত থাকিতেন। আহারে বসিতেছেন, এমন সময় কোন অভুক্ত লোক

আসিলে তিনি সেই অন্ন তাহাকে দিয়া নিজে উপবাসী থাকিতেন, অথবা বধূগণ রাঁধিয়া দিত। দ্বিপ্রহরে গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া বাজারের ফেরত অভুক্ত লোক দেখিলে তাহাদিগকে আহার অথবা জলযোগ করাইয়া দিতেন। একবার বিদ্যাসাগর বাড়ীর জন্য ছয়খানি লেপ পাঠাইলে তাঁহার জননী তাহা শীতার্ত্ত দরিদ্রগণকে বিতরণ করেন। অনেক সময়ে তাঁহাকে খুঁজিতে যাইয়া দেখা যাইত তিনি কোন অস্পৃশ্য জাতির গৃহে বসিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। সর্ব্বদাই সাগু, মিছিরী তাঁহার সঙ্গে থাকিত, পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর জননীর কথায় বলিতেন,—"আমি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ পাইলেও কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরব বলিয়া মনে করি।" একবার হ্যারিসন সাহেব কোন কার্য্যোপলক্ষে বীরসিংহে যান। বিদ্যাসাগর সাহেবকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলে সাহেব আসিয়া আহারে বসিলেন, ভগবতী দেবী স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া সাহেবকে নিকটে বসাইয়া আহার করাইতে লাগিলেন। সাহেব বাঙ্গলা জানিতেন, অন্যান্য কথার পরে তিনি ভগবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আপনার কত টাকা" ? ভগবতী দেবী নিকটস্থ চারিপুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন :— "কেন, আমার এই চারি ঘড়া ধন।" সাহেব বিদ্যাসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন :—"এমন মা না হ'লে কি এমন ছেলে হয়?" বলা বাহুল্য যে বিদ্যাসাগরও জননীর অনুকরণেই গঠিত হইয়াছিলেন।

একবার বিদ্যাসাগরের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার কোন বিষয়ে মনান্তর হয়, তাহাতে দীনবন্ধু অনেক দিন ভ্রাতার সাহায্য লন নাই। কিন্তু শুনা যায়, তিনি গোপনে মধ্যম ভ্রাতৃবধূর অঞ্চলে টাকা বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন :—"মা এই নাও, দীনকে বলোনা, আমি জানি তোমাদের ক্লেশ হইতেছে।" দীনবন্ধু ইহা জানিতে পারিয়া ঐ টাকা ভ্রাতাকে ফেরত দেওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বলেন যে বাবার পীড়া বৃদ্ধির সময়

আমি তাঁহাকে কর্ম্মাটারে যাইয়া বিশ্রাম করিতে বলায়, তিনি "আমার কি যাবার পথ রেখেছি ?" এই কথা বলিয়া সজলনয়নে আমার দিকে চাহিয়া একখানি তালিকা পুস্তক আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে দেখিলাম, তাঁহার মাসিক দান আট শত টাকা। তদ্ভিন্ন সাময়িক ও এককালীন দান স্বতন্ত্র ছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় বলিলেন :— "আমার এক আত্মীয়ের হাতে ২৫০০ টাকা দিয়া তিন মাসের বিদায় লইয়া গত বৎসর কর্ম্মাটারে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, মাস মাস যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিবে। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই চারিদিক হইতে সংবাদ পাইলাম, কেহই মাসহারার টাকা পায় না। আত্মীয়ের নিকট অনেকগুলি পত্র লিখিয়াও উত্তর না পাইয়া তাগাদার জ্বালায় চলিয়া আসিলাম। আসিয়া আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি সে টাকা খরচ করিয়াছেন এবং দিতে পারিবেন না। তখনই আবার ২৫০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিলাম এবং সকলের প্রাপ্য দিয়া বিশ্রাম জন্য গেলাম।"

১২৮৭ সালে তাঁহার পিতা কাশীবাস কালে অত্যন্ত পীড়িত হন। পীড়ার সংবাদ পাইয়া ঈশ্বরচন্দ্র তিন ভ্রাতা ও জননীকে সঙ্গে লইয়া পিতার শুশ্রূষার্থ কাশী যান। পিতা আরোগ্য হইলেন, কিন্তু দুই মাস পরে চৈত্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের জননী ভগবতী দেবী কাশীপ্রাপ্ত হইলেন। জননীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন। মাতৃ-হীন বালকের ন্যায় তিনি সর্ব্বদাই কাঁদিতেন। জননীর মৃত্যুকালে নিকটে থাকিতে ও সেবা করিতে পান নাই বলিয়া তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, সে কষ্ট তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। এক বৎসর তিনি স্বপাক, একাহার, নিরামিষ ভোজন, বিনামা, ছত্র ও শয্যা ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন-বাসী হইয়াছিলেন। তিনি হাঁটিতে খুব পটু ছিলেন এবং প্রায় স্থানে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিতেন, একবার কোন কার্য্যগতিকে তিনি গাড়ী

করিয়া বাটী আইসেন ও দশ আনা ভাড়া লাগে, ঐ ভাড়া দিবার সময় তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "এই দশ আনা মিথ্যা গেল।" দ্রব্যাদি কিনিয়া আসিলে তিনি মোড়কের কাগজ ও কাগজ বাঁধা দড়ীগুলি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন। পত্রাদি আসিলে তাহার সাদা কাগজ অংশ কাটিয়া টেবিলে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার এক চাকরাণী বাটনা বাটিয়া শীল ধোয়া জল ফেলিয়া দিলে বিদ্যাসাগর দেখিতে পাইয়া বলিলেন: "হলুদের জলটা ফেলে দিলে?" দাসী অবাক হইয়া বলিল, "দাদা মশাইএর কত টাকা যাচ্চে, সে দিকে নজর নাই, আর এই হলুদের জলটুকুতে নজর পড়েছে!" তিনি বলিলেন; "হলুদের জলটুকু তরকারীতে দিলে কাজে লাগতো, আমিতো আর টাকা জলে ফেলে দিই না, লোককে দিই।" ১৮৩৩ খৃঃ কবি মধুসূদন দারুণ অর্থকষ্টে ঋণদায়ে ভাবী কারাবাস আশঙ্কায় দুঃখে কাতর হইয়া পড়েন এবং নিতান্ত নিরাশ হইয়া বিপন্নের সহায় বিদ্যাসাগরকে ভার্শেলিস্ নগর হইতে অর্থভিক্ষা করিয়া পত্র লিখেন। তখন বিদ্যাসাগরের ভয়ানক দুরবস্থা, তিনি নিজেই ঋণ জালে জড়িত, তাহা সত্বেও তিনি ঋণের উপর ঋণ করিয়া মধুকে অর্থ দিয়া রক্ষা করিলেন, কিন্তু মধুসূদন দেশে আসিয়া ঋণ পরিশোধ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের সহিত একবার সাক্ষাৎ অবধি করেন নাই। তাই মধুর মৃত্যুর পরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ বিদ্যাসাগরের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিলে তিনি সজলনয়নে বলিয়াছিলেন:—"দেখ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার জান্ রাখিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।" ১৮৭৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়, বিদ্যাসাগর অন্নছত্র খুলিয়া বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহুগ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে চারি মাস ধরিয়া একাদিক্রমে অন্ন বিতরণ করেন। ঐ সময়ে নিয়ত বার জন ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন রন্ধন ও কুড়ি জন লোক অবিশ্রান্ত পরিবেশন করিয়াছে। তাহাদিগের ক্লান্তি হইলে আবার নূতন লোক নিযুক্ত হইত। ঐ সময়ে কোনও একটী

লোক তরকারীর অপেক্ষা না করিয়া শুক অন্ন মুখে দেওয়ায় দম আট-কাইয়া মরিয়া যায়, দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর সেই মৃত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিলেন। খাইতে গিয়া মরিয়া গেল, এ দুঃখ তিনি কখন ভুলিতে পারেন নাই। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হাড়ী, ডোম, প্রভৃতি ইতর জাতীয় লোকদিগের মাথায় তিনি স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন।

বর্দ্ধমান অবস্থান কালে সাংঘাতিক জ্বরে বর্দ্ধমানের লোক সকল যখন মৃতপ্রায়, বিদ্যাসাগর তখন দীন দুঃখীর দ্বারে দ্বারে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সাহায্যে অনেকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। মুসলমান এবং অন্যান্য অতি নীচ জাতীয় রুগ্ন শিশুগণকে তিনি ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইয়াছেন। কর্ম্মাটারের অসভ্য সাঁওতালগণই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র ছিল। বর্দ্ধমান হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন খেজুর সাঁওতালদিগের জন্য লইয়া যাইতেন। এই খেজুর খাইয়া তাহারা আরও খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া একবার ১০।১২ বস্তা খেজুর লইয়া গিয়া তাহাদিগকে খুব খাওয়াইয়াছিলেন। তাহারা নির্ভয়ে তাঁহার হাত হইতে কাড়াকাড়ী করিয়া খাবার খাইত। পূজার সময় সাঁওতালগণকে নূতন কাপড় দিতেন। কর্ম্মাটারে বাসকালে একদিন এক মেথর আসিয়া তাহার মেথরাণীর কলেরার সংবাদ দেয়, তিনি সেই সংবাদ পাইবা মাত্র ঔষধের বাক্স সঙ্গে করিয়া সেই মেথরের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হন এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মেথরাণীর শুশ্রূষা করেন। এইরূপে ছাত্রাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তিনি কি রাত্রি কি দিবা কাহারও (বিশেষ দীন দুঃখীগণের মধ্যে) পীড়ার কথা শুনিলেই ছুটিয়া যাইতেন এবং জননীর ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পীড়িতের শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেন। কোনও একটী গৃহস্থের বধূ উন্মাদাবস্থায় জিদ ধরে যে সে বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কাহারও হাতে খাইবে না। তাই তিনি একাদিক্রমে ছয় মাস ধরিয়া সেই উন্মাদিনীকে প্রতিদিন স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়া

আসিতেন। মনুষ্যগণ গোবৎসের মুখের দুধ কাড়িয়া লইয়া দোহন করিয়া লয় দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হওয়ায় তিনি চৌদ্দ বৎসর দুগ্ধ পান করেন নাই। তাহার পরে তাঁহার পীড়ার সময় চিকিৎসকগণের অনুরোধে দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। একবার বীরসিংহ যাইবার পথে তাঁহার পালকী নামাইলে একটী বালক আসিয়া বলিল, "বাবু একটী পয়সা দেবেন?" শিশুপ্রিয় বিদ্যাসাগর বলিলেন, "একটী পয়সা কি করবি?" "কেন খাবার খাব।" "যদি দুটী পয়সা দি?" "আজ এক পয়সা কাল এক পয়সা খাব।" যদি চার পয়সা দি?" "হাটে আম কিনে গাঁয়ে বেচে দু'আনা ক'রবো।" বিদ্যাসাগর বালকের কথায় খুসী হইয়া তাহাকে বেশী পয়সা দিয়া বলিয়া যান যে, "এই পয়সায় টাকা করিতে পারিলে তোকে টাকা দিয়া দোকান করিয়া দিব।" প্রত্যাগমন কালে সে টাকা করিয়াছে দেখিয়া তাহাকে দোকান করিয়া দেন এবং নিজব্যয়ে তাহার বিবাহ দিয়া দেন। তাঁহার স্থাপিত মেট্রপলিটন কলেজে অবৈতনিকরূপে অনেক ছাত্র পড়িত। তাহাদিগের মধ্যে অনেকের অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালনের ভারও লইয়াছেন। কত লোক প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা, পুস্তক, বস্ত্র প্রভৃতি কতই যে লইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর কেবল মা নাই বলিয়া অনেক বালক তাঁহার সাহায্য পাইয়াছিল। এক পুস্তক বিক্রেতা স্কুলছাত্র বলিয়া প্রতিবৎসর ক্লাসে উঠিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুস্তক লইত এবং তাহাই বিক্রয় করিত। পরে তিনি তাহা জানিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন পিতৃমাতৃদায়, কন্যা দায় প্রভৃতির জন্য অর্থব্যয়ের সংখ্যাও তাঁহার কম ছিল না। মহেন্দ্র সরকারের বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য তিনি ১০০০৲ টাকা দান করেন। প্রকাশ্যে দান অপেক্ষা গুপ্ত দানই তাঁহার অধিক ছিল। আহারের পূর্ব্বে কিম্বা আহারের সময় কেহ আসিলে খাওয়া হইয়াছে কি না অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন। আত্মীয় বন্ধু-

দিগের মধ্যে পীড়াবশতঃ কেহ কার্য্যে অশক্ত হইলে, কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক কাহার কাজ কর্ম্ম না থাকিলে তাহার সংবাদ লওয়া, তাহার সাহায্য করা এবং কেমন করিয়া চলিতেছে এ কথাটী আগে জিজ্ঞাসা করিতেন। আবার কেহ তাঁহার সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করিলে প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেন। কোন একজন ধনী লোক তাঁহার নিকট হইতে একখানি মূল্যবান পুস্তক লইয়া যায় এবং তাহা এক পুস্তক বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে, ঐ ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের বাটী আসিলে তিনি তাঁহার গ্রন্থ চিনিতে পারেন এবং ঐ ভদ্রলোকের ব্যবহারে বিশেষ বিস্মিত ও দুঃখিত হন ও তৎক্ষণাৎ বহুমূল্যে ঐ গ্রন্থ কিনিয়া লন। দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের প্রতারণা ও মিথ্যাচরণে মানুষের প্রতি তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। তিনি শেষজীবনে দুঃখ করিয়া বলিতেন, "এ দেশের উদ্ধার হ'তে বহু বিলম্ব আছে।" কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে শুনিলেই বলিতেন, "রও, ভেবে দেখি, সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি ত কখনও তাহার কোন উপকার করি নাই।" উপকৃত ব্যক্তিগণই যে বেশী কৃতঘ্ন হয়, শেষে এই ধারণাই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এরূপ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, কারণ তিনি লোকের সেবা, উন্নতি ও সর্ব্বপ্রকার সুখসাধন করিতে যাইয়া যেরূপ প্রতি পদে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও প্রতারিত হইয়াছেন এবং তাহা সত্ত্বেও তিনি যেরূপ অদম্য উৎসাহ ও নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতসাধনে জীবনক্ষয় করিয়াছেন, এরূপ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

একবার কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিদ্যাসাগর যাদুঘর দেখাইতে লইয়া গেলে যাদুঘরের দ্বারবান তাঁহাকে চটি খুলিয়া যাদুঘরে যাইতে বলে, তাহা শুনিয়া তিনি ভদ্রলোককে বলিলেন; "আপনাকে অন্য লোকের সঙ্গে পাঠাইয়া দিব, আমি আর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব না।" ঐ গৃহের কর্ত্তৃপক্ষ সাহেব ইহা শুনিয়া তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং

বহুসাধ্য সাধনা করিয়াও আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। ইহার পরে বড় বড় ইংরাজগণ তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পরিচ্ছদে যাদুঘরে যাইতে কত অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। তদুত্তরে তিনি লিখিয়া পাঠান যে, "আমার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণের জন্য এক নিয়ম ও আমার জন্য আর এক নিয়ম, ইহাতে প্রশ্রয় দিতে আমি কোন মতেই সম্মত নহি।" ইহা লইয়া কত লেখালেখি হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি আর সে দ্বারে পদার্পণ করেন নাই। ১৮৮৩ খ্রীঃ কলিকাতার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সময় উহা দেখিবার জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকের মুখে শুনে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু শুনিয়াছি যে সেই বড় বাড়ীটার বড় দরজা পার হইয়া নাকি প্রদর্শনীতে যাইতে হয়, তা' হ'লে আর আমার কেমন করে যাওয়া হয়? আমি ত আর এ জীবনে সে দরজায় পা দিবনা।"

অনেকে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলিত, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার স্নেহের পাত্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন যে "বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক ছিলেন। কিন্তু কাহাকেও ঐ সকল জানিতে দিতেন না, সকল সময়ই গোপন করিয়া চলিতেন।" তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়াও তাহাই বোধ হইত। রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি সাধুগণকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। ১২৯৫ সালের ১লা ভাদ্র তাঁহার পত্নী দীনময়ী দেবী পরলোক গমন করেন। এই পত্নী বিয়োগে তিনি শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর অনেক দিন হইতেই নানারূপ পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রথমে স্বাস্থ্যের জন্য ফরাসডাঙ্গায় কিছুদিন বাস করেন, পরে পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় কলিকাতায় আইসেন এবং প্রথমে হাকিমী চিকিৎসা

করান, তাহাতে উপকার না হওয়ায় ডাক্তারি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিন চারি জন বাঙ্গালী চিকিৎসক ও দুই জন ইংরাজ চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়াও তাঁহার পীড়ার কোন উপশম করিতে পারিলেন না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ১৩ শ্রাবণ রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় বঙ্গের কৃতী সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিরদিনের মত বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে যে কার্য্যের জন্য এ মরধামে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া মহাপুরুষের অমরাত্মা স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। চন্দন কাষ্ঠের পালঙ্গে শয়ন করাইয়া নিমতলার মহাশ্মশানে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। সে দিন নিমতলার শ্মশানঘাটে যেরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, সেরূপ বিরাট লোক সমাগম, সেরূপ বিষাদ দৃশ্য আর কখনও কাহারও নেত্রগোচর হয় নাই। স্নান করাইয়া চিতায় শয়ন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহার যে ফটোখানি তোলা হইয়াছিল, তাহা দেখিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না।

আমাদের দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের অভাবজনিত শোকে লক্ষপতি ধনী হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্ন পথের ভিক্ষুক অবধি সকলেই অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়াছিল, সকলেরই প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল এবং সকলেই হায় হায় করিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে শত শত স্কুলের ছাত্র, সহস্র সহস্র দুঃখী দরিদ্রগণও পিতৃহীন হইয়াছিল। ছাত্রগণ পাদুকা ত্যাগ করিয়া তাঁহার মৃত্যুজনিত অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিল। সংবাদপত্র সকল তাঁহার জন্য অনেক কাঁদিয়াছিল। কলিকাতার প্রতি গৃহে ও প্রতি স্কুল কলেজে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। বঙ্গের সর্ব্বত্রই বহু সভাসমিতি করিয়া তাঁহার প্রতি শোক প্রকাশ করা হয়। অনেক স্থানে তাঁহার তৈলচিত্র স্থাপিত হয়। ঢাকার রাজা রাজেন্দ্র রায় বাহাদুর "বিদ্যাসাগর স্কলারশিপ" নামে

মাসিক দশ টাকার একটী বৃত্তির জন্য ৩০০০ টাকা দান করেন। কিন্তু যিনি 'বধবাবিবাহ, বালিকা বিদ্যালয়, গরীব সেবা প্রভৃতি বহুবিধ দেশ হিতকর ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন এবং এতদর্থে লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এই অর্থকে আমরা তাঁহার উপযোগী বলিতে পারি না।

ঈশ্বরচন্দ্রের চারি কন্যা ও একপুত্র। ঔষধ সেবনে পুত্র হওয়ায় পুত্রের নাম নারায়ণ রাখা হয়। দুই কন্যার অকালবৈধব্য, ভ্রাতাগণ ও একমাত্র পুত্রের সহিত মনান্তর প্রভৃতি নানা কারণে উত্যক্ত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র কি পারিবারিক, কি সামাজিক কোন জীবনেই সুখী হইতে পারেন নাই। অনেক মর্ম্মপীড়া পাইয়াছেন এবং সে জন্য তিনি অনেক সময় দুঃখ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দীন দুঃখীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার সংগ্রামে সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করা সামান্য মানবের কর্ম্ম নহে এবং কম গৌরবের কথা নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, আত্মশাসনক্ষম, পরিশ্রমী, কর্ম্মসহিষ্ণু, স্বদেশ-বৎসল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, দয়ালু, স্বাধীনচেতা, বিলাসবিহীন ও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে পরোপকার প্রবৃত্তি জগতে অতি দুর্লভ। সর্ব্বোপরি তাঁহার অতুলনীয় পিতৃমাতৃভক্তির কথা বঙ্গের গৃহে গৃহে জলন্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮২৪ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শুঁড়া নামক একটী গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা বড়িশার মিত্র ও মুখ্যকুলীন বলিয়া কায়স্থসমাজে প্রসিদ্ধ। রাজেন্দ্রলালের

পূর্ব্ব পুরুষগণের আদি বাসস্থান বড়িশায় ছিল, তৎপরে তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ একজন আসিয়া প্রথমতঃ কলিকাতার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুরে বাস করেন, পরে মেছুয়াবাজার হইতে শুঁড়ায় যাইয়া বাস করেন।

রাজেন্দ্রলালের বংশের আদি পুরুষের নাম কালিদাস মিত্র, তিনি গৌড়রাজের সভায় প্রথম আহুত হন। উক্ত কালিদাস হইতে অধঃস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ সত্যভাম মিত্রের পৌত্র রামরাম মিত্র মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে দেওয়ান হন। তৎপুত্র অযোধ্যারাম সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। অযোধ্যারামের পৌত্র পীতাম্বর মিত্র দিল্লী দরবারে অযোধ্যার নবাব উজীরের পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন, পরে সম্রাটের অধীনে চাকুরী করিয়া রাজাবাহাদুর উপাধি এবং তিন হাজারী মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হন ও তৎসঙ্গে সম্রাটের নিকট হইতে দোয়াবের অন্তর্গত কড়া প্রদেশ জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন। ১৭৮৪ খৃঃ বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের বিদ্রোহের সময় তাঁহার দমনার্থ তিনি ইংরাজ সেনাপতি পামারের সাহায্য জন্য তথায় গমন করেন। রাম-নগরদুর্গ অধিকারকালে তিনি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ১৭৮৭-৮৮ খৃঃ মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮০৬ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র পিতৃসম্পত্তি ও উপাধির অধিকারী হন। রাজা পিতাম্বর দিল্লী সরকারের কর্ম্ম পরিত্যাগকালে নবাব সুজা উদ্দৌলার নিকট হইতে বাকি হিসাবে নয় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় তাঁহার দুইলক্ষ কুড়ী হাজার টাকার কড়া জায়গীর হস্তচ্যুত হয়। বৃন্দাবনচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই পিতৃসম্পত্তি নষ্ট করিয়া কটক কালেক্টরির দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন। রামনগর লুণ্ঠন সময়ে রাজা পিতাম্বর কতকগুলি সংস্কৃত ও পারসী পুঁথি প্রাপ্ত হন এবং তাহাই লইয়া কলিকাতায় আইসেন। তিনি বৈষ্ণব হইবার পর কলি-

কাতার বাসবাটী ছাড়িয়া শুঁড়ার বাগানবাড়ীতে যাইয়া বাস করেন। বৃন্দাবনচন্দ্রের অপরিমিত ব্যয়বশতঃ যাবতীয় পৈতৃকসম্পত্তি ও কলিকাতার মেছুয়াবাজারের বাটী অবধি নষ্ট হইয়া যায়। বৃন্দাবনের জ্যেষ্ঠপুত্র জনমেজয় মিত্র পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত ও পারসীক পুঁথি ভিন্ন আর কিছুই পান নাই। ঐ পুঁথি লইয়া তিনি স্বীয় জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালাভ করিয়া কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেন। কোনও পণ্ডিতের নিকট তিনি সর্ব্বপ্রথম কিমিয়বিদ্যা পাঠ করেন। এই জনমেজয়ের পুত্রই রাজা রাজেন্দ্রলাল।

রাজেন্দ্রলাল পঞ্চমবর্ষ বয়ক্রমের সময় প্রথম পারস্য বর্ণমালা পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পরে তিনি রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের গৃহ শিক্ষকের নিকট বাঙ্গালা পড়েন। তিন বৎসর তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা পাঠ করিয়া পাথুরিয়াঘাটানিবাসী ক্ষেম বসুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। একাদশ বর্ষ বয়সে তিনি গোবিন্দ বসাকের স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৩৮ খৃঃ রাজেন্দ্রলাল নানারূপ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং বৎসরাবধি রোগ ভোগ করিয়া নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্কুল পরিত্যাগ করেন। তাহার পরে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। এ সময়েও মিঃ কামেরণ তাঁহাকে শিক্ষা বিষয়ে গৃহে সাহায্য করিতেন। রাজেন্দ্রলাল মেডিকেল কালেজে প্রতি বৎসরেই পারিতোষিক পাইতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজেন্দ্রলালের প্রতিভা দর্শনে তাঁহাকে বিলাতে লইয়া গিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই ব্যয়ভারও তিনি নিজেই বহন করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু জনমেজয় মিত্র এই সংবাদ শুনিবা মাত্র পুত্র রাজেন্দ্রলালকে মেডিকেল কালেজ হইতে নাম কাটাইয়া গৃহে লইয়া আসেন। এই ঘটনায় তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সদর আদালতে ওকালতি করি-

বার কিম্বা মুন্‌সফিতে নিযুক্ত হইবার অনুমতি পান, কিন্তু ইহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি জজিয়তির জন্ত পরীক্ষা দেন। অদৃষ্টক্রমে তাঁহার লিখিত উত্তর পত্র হারাইয়া যাওয়ায় এবং ঐ পরীক্ষা পরবৎসর হইতে উঠিয়া যাওয়ার জন্য তিনি তদর্থে আর চেষ্টা করেন নাই। উল্লিখিত কারণ বশতঃ তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ঐ সকল ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য-আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ইহার পরে তিনি গৃহে বসিয়া সংস্কৃত, হিন্দি, পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই ঐ সকল ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ নবেম্বর মাসে কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। এই কার্য্যে তিনি ১০ বৎসর থাকিয়া সাহিত্য চর্চ্চার উত্তম সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ মার্চ্চ মাসে তিনি গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডের ডিরেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলালের বিবাহ হয়, কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ ঘটে। আর বহু দিবস তিনি বিবাহ করেন নাই। তৎপরে ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহিত হন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল কোন স্কুল কালেজেই শিক্ষিত হন নাই। তিনি গৃহে বসিয়া স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম গুণে নিজের উন্নতি নিজে সাধন করিয়াছিলেন। তিনি গৃহে বসিয়া ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দী ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন এবং মেডিকেল কালেজে পাঠকালে ফরাসী, লাটিন, গ্রীক শিক্ষা করেন এবং এসিয়াটিক সোসাই-টিতে বাসকালীন কিছু কিছু জর্ম্মণভাষাও শিখিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃঃ কোনও ইংরাজী পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রচিত ইংরাজী প্রবন্ধ বাহির হয়। ১৮৪৯ খৃঃ তিনি "কামন্দকীয়—নীতিসার" নামক একখানি সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৫১ খৃঃ তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ তাঁহার উড়িষ্যার

পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্থাপত্যবিদ্যা, ধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের পৌরাণিক ইতিহাসের যথেষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার রচিত "বুদ্ধগয়া" প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি ভগ্নমন্দিরাদির নিদর্শন, শিলালিপি ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির অনেক পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার বিষয়ে বৃটানিকার জীবনীলেখক অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ পড়িয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার অত্যন্ত সমাদর ও সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ডাঃ মাক্স-মূলর প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান প্রধান প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-গণের সহিত ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার অনেক লেখাপড় চলিয়াছিল।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনপ্রশংসিত এবং অতি আদর্শনীয় ছিল। তাঁহার অতুল প্রতিভ ও অসাধারণ জ্ঞানজ্যোতিঃ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে এল, এল, ডি উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ খৃঃ দিল্লীদরবারে লর্ড লিটন বাহাদুর রাজকীয় উপাধি ঘোষণাকালে ডাঃরাজেন্দ্র লাল 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ খৃঃ হইতে তিনি কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সভাপতির কার্য্য করিতেছিলেন। ১৮৬৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল হাঙ্গেরিস্থ বৈজ্ঞানিক সভার বৈদেশিক সভ্য মনোনীত হইয়া উক্ত সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। বুডাপেষ্ট নগরীর "সণ্ডে নিউস" নামক পত্রিকায় তাঁহাকে ভারতীয় গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি বৈদেশিক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের আদেশানুসারে ফ্রান্সরাজ্যের রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন। ইহার পর ১৮৮৫ খৃঃ তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভাপতিত্ব গ্রহণ

করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অপরাপর সমুদয় উপাধি ও পদমর্য্যাদা অপেক্ষা বিদ্বৎসভার এই সম্মান রাজেন্দ্রলালের নিকট অধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার এই জ্ঞানালোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া ও তাঁহার আভিজাত্য লক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই ও তৎপরে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। য়ুরোপীয়গণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্ত উদ্ধারের মুখ্যপাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গবাসীদিগের নিকটও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আসন পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। রাজা রাজেন্দ্রলাল একরূপ চিররুগ্ন ছিলেন বলিলেই হয়, কিন্তু সেই রুগ্ন ও ভগ্ন শরীর লইয়াও জ্ঞানানুশীলনার্থ অদম্য উৎসাহভরে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি অহোরাত্র যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সেরূপ সচরাচর প্রায় দেখা যায় না। এই অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ ক্রমশঃ তাঁহাব শরীর ক্ষয় ও জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে থাকে। অতঃপর ১৮৯১ খৃঃ ২৯শে জুলাই ৬৭ বৎসর বয়সে রাজা রাজেন্দ্রলাল পরলোকগমন করেন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত গ্রন্থ সমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইংরাজী—১। উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব—দুইভাগ। ২। সাম বেদান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ। ৩।১৮৭১।১৮৭৪ খৃঃ প্রাপ্ত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী। ৪। এসিয়াটিক সোসাইটীর যাদুঘরে সংগৃহীত ভারতীয় বিস্ময়-দ্যোতক দ্রব্যনিচয়ের বিবরণীসহ তালিকা। ৫। এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারের তালিকা। ৬। সংস্কৃতব্যাকরণ সমূহের সমালোচনাপূর্ণ তালিকা। ৭। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকার ১ হইতে ২৪ ভাগের সূচী পত্র। ৮। বুদ্ধগয়া। ৯। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা। ১০। আর্য্য হিন্দু—দুই ভাগ।

সংস্কৃত—১। যজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১৮৫৪—১৮৬৯। ২।

ঐ ঐ আরণ্যক ১৮৭২। ৩। ঐ প্রাতিশাখ্য ১৮৭২। ৪। অথর্ব্ববেদান্ত-গত গোপথ ব্রাহ্মণ ১৮৭২। ৫। কামন্দকীয় নীতি •১৮৪৯। ৬। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ১৭৮৪। ৭। ললিত বিস্তর ১৮৫৪-১৮৭৭। ৮। অগ্নিপুরাণ ১৮৭৩-৭৮। ৯। ঐতরেয় আরণ্যক ১৮৭৬।

বাঙ্গালা—১। বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫০—৫৬ খৃঃ) ২। রহস্য সন্দর্ভ (১৮৫৮—৬০) ৩। প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪) ৪। পত্রকৌমুদী (১৮৬৩) ৫। ব্যাকরণ প্রবেশ (১৮৭৩) ৬। শিবাজীর জীবনী (১৮৬২) ৭। মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১) ৮। ইহা ব্যতীত 'ভারতবর্ষের বাঙ্গালা' নাগরী, পারসী মানচিত্র; এসিয়ার পারসী মানচিত্র; স্কুলের জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মানচিত্র; ভৌতিক মানচিত্র প্রভৃতি তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে সম্পাদিত হইয়াছিল। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল চাকুরী হইতে অবসর লইয়া মাসিক পাঁচ শত টাকা পেনসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবর হেমচন্দ্র ১২৪৫ সালের ৬ বৈশাখ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গুলিয়াগ্রামে মাতামহ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র স্বীয় গ্রাম্য পাঠশালায় প্রথম বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতামহের সহিত কলিকাতায় আসেন এবং খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দুকালেজে প্রবেশ করেন। কৈলাসচন্দ্র একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে দুর্লভ কবিপ্রতিভা লইয়া বঙ্গগৌরব হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাকে বহু অর্থ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ

৫।৬ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া কালেজে আসিতেন। একজন সদাশয় সাহেব হেমচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া দয়া করিয়া হেমচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি দশটী টাকা দেন। সেইভাবে সেই সাহেবের অনুগ্রহে ও আরও দুই একজন মহানুভব দয়ালুব্যক্তির কৃপায় হেমচন্দ্র লেখাপড়া শিখেন। এই হিন্দুকালেজে তিনি জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া বর্ত্তমান নিয়মানুসারে এল এ, বি এ, পরীক্ষার রীতি প্রচলিত হইলে হেমচন্দ্র এক বৎসরের মধ্যেই সিনিয়ার পরীক্ষা ও এল এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান, কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তাঁহার প্রেসিডেন্সী কালেজে বি এ, পড়া হইল না। তিনি মিলিটারি অডিটার জেনারেলের অফিসে ৩০৲ টাকা বেতনের একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং সেখান হইতেই বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন সংস্কৃত কালেজে শিক্ষকতা করেন। তৎপরে কলিকাতায় ট্রেনিং স্কুলে ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকের কার্য্য লন। তাহার পর বি এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন অস্থায়ীভাবে শ্রীরামপুর, হাবড়া প্রভৃতি স্থানে মুন্সেফী করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬১ খৃঃ অগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতীর সময়ে ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পশার বৃদ্ধি হয়, তিনি হাইকোর্টের উকিল-সরকার পদে উন্নীত হন। তিনি উকিলদিগের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে এক সময়ে তাঁহাকে হাইকোর্টের জজের পদেও প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু নিজের অত্যধিক দানশীলতা ও অপরিমিত ব্যয়ের জন্য কিছুই সংস্থান করিতে পারেন নাই। তাঁহার দীনে দয়া, বিপন্নের সহায়তায় প্রতিমাসে বহু অর্থ ব্যয় হইত। মাতৃপিতৃদায়গ্রস্থ ব্যক্তিগণ, অসহায় বিধবা, দরিদ্র ছাত্রবর্গ যে কেহ হউক, তাঁহার নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কেহই রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই, বরং অনেকেই

আশার অতিরিক্ত দান প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক অনাথ নিরন্ন আত্মীয় কুটুম্বকে তিনি হৃষ্টচিত্তে প্রতিপালন করিয়াছেন। এই সকল কারণে কোন কোন সময়ে তাঁহার এত অধিক ব্যয় হইয়া যাইত যে তাঁহাকে ঋণ করিতে হইত। বস্তুতঃ তিনি সকল সৎকর্ম্মেই মুক্তহস্ত ছিলেন। ঐ সকল সৎকর্ম্মে দান করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। হায়! এরূপ মহানুভব দয়ালু কবিরত্নের পরিণামের কথা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় ও চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না।

বাল্যকালে হেমচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী পড়িতে বড় ভালবাসিতেন এবং অনেক সময় ঐ সকল গ্রন্থাবলী তন্ময়চিত্তে পাঠ করিতেন—সেই অবধি তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ চিন্তা তরঙ্গিনী, বীরবাহু কাব্য ইহার কিছু পরে রচিত হয়। কিন্তু কবিতাবলীতেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে অনেকে মেঘনাদবধ কাব্য হইতেও "বৃত্রসংহার কাব্যকে" উচ্চ অঙ্গেব কাব্য বলিয়া পরিচয় দেন। হেমচন্দ্রের কল্পনা সুদূর প্রসারিত, কিন্তু তাহা সংযত. এই জন্য তাঁহার বৃত্রসংহার তুষারভূষিত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত রহিয়া কেবল দূর হইতে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। হেমচন্দ্রের কবিতায় যেরূপ ওজস্বিনী ভাষা দৃষ্ট হয়, সেরূপ অন্য কোন কবির ভাষায় প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার স্বদেশপ্রিয়তা স্বদেশবৎসলতার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত ভারত-বাসীর প্রাণে প্রাণে চিরদিন প্রবাহিত থাকিবে এবং ভারতের অতীত গৌরবস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিবে।

বৃদ্ধাবস্থায় হেমচন্দ্র ওকালতী ত্যাগ করেন এবং খিদিরপুরের স্বীয় আবাসেই বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার একটী প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হয়, পুত্রের এই অকাল মৃত্যুতে তিনি অতিশয় শোকাকুলিত

হন। পরোপকারী উদারহৃদয় অন্ধকবির শেষ জীবন বড় শোচনীয়, যাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে এক সময়ে শত শত লোক প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই বদান্যবর কবিকে শেষজীবনে পরমুখাপেক্ষী, পরপালিত হইয়া নিতান্ত দীন হীনের ন্যায় কালক্ষেপণ করিতে হইয়াছিল, ইহা হইতে অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইনি জীবনে কখনও স্বপ্রণীত অমূল্য গ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব নিজে গ্রহণ করেন নাই, পুস্তক প্রকাশকেরা তাঁহার গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া এই দীর্ঘকাল প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছে। ঐ সকল অর্থের প্রতি তিনি কখনও ফিরিয়াও চাহেন নাই। শেষ জীবনে তিনি পারিবারিক অশান্তিও যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত চিত্তবিকাশ পাঠ করিলেই তাঁহার গভীর মর্ম্মবেদনার বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পুত্রশোক ও ভীষণ দরিদ্রতা হইতেও অন্ধতায়ই তাঁহার দুর্লভ জীবনকে শেষে অধিক অশান্তিকর ও দুঃসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ২৫টী টাকা বৃত্তি দিয়া এবং আরও দুই চারিটি সদাশয় ব্যক্তি মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিয়া পুত্রশোকাতুর অন্ধ কবি ও তৎপরিবারবর্গকে পরম উপকৃত করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ বঙ্গের অমর কবি হেমচন্দ্র যন্ত্রণাময় পৃথিবীর সকল দুঃখ কষ্ট ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। একদিন যিনি ভারতের চিরদুঃখিনী বাল-বিধবা ও কুলীন কুমারীগণের দুঃখে অভিভূত হইয়া চক্ষের শতধারা কবিতা লহরীতে প্রবাহিত করিয়া ভারতকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন, যাঁহার ওজস্বিনী ভাষা নারীবৈরীদিগের উপর বজ্রনাদে অভিসম্পাত করিয়াছে, সেই দুর্ভাগা বঙ্গমাতার অমূল্য নিধি কবিগুরু হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে ভারত-বাসী দুই বিন্দু অশ্রুবারি ফেলিয়া জানিনা তাঁহার স্মৃতিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন কিনা? হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গের স্থানে স্থানে তাঁহার জন্য সভা সমিতি করিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদের মহানুভব ব্যক্তিগণের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় সাহিত্য পরিষদমন্দিরে বঙ্গগৌরব কবিবর হেমচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অমর গ্রন্থ একমাত্র কবিতাবলী তাঁহার স্মৃতিকে এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর করিয়া রাখিবে।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৩৮ খৃঃ ২৭ জুন নৈহাটী ষ্টেশনের পার্শ্ববর্ত্তী কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্গের অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক কবি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম যাদবচন্দ্র, তাঁহার চারি পুত্র শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। তাঁহার পিতা লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন সময়ে ডেপুটী কলেক্টরী কর্ম্ম করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিম চন্দ্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময় একদিনেই তাঁহার বর্ণজ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি কাঁটালপাড়া গ্রামেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। বঙ্কিম চন্দ্রকে কাছে রাখিয়া লেখা পড়া শেখান, তাঁহার পিতার বরাবর এই ইচ্ছা ছিল। উক্ত ইচ্ছানুক্রমে তিনি স্বীয় কর্ম্মস্থান মেদিনীপুরে অষ্টম বর্ষীয় বালক বঙ্কিমকে লইয়া গিয়া মেদিনীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ঐ সময় বঙ্কিমের বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দর্শনে শিক্ষকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর দুইবার উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়াও সকলের প্রথম থাকিতেন। মেদিনীপুরস্থ কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মনোহারিণী সুশোভন নদীতটের নির্জ্জন সৌন্দর্য্য বঙ্কিম চন্দ্রের ভাবময় চিন্তাশীল কবিহৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত ছিল, তাঁহার কপাল কুণ্ডলার দৃশ্যাবলীতে সেই আলেখ্যের ছায়া সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

১৮৫১ খৃঃ যাদবচন্দ্র চব্বিশ পরগণায় বদলী হইয়াছিলেন, বঙ্কিমও এ সময়ে হুগলী কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন। কালেজেও তাঁহার শিক্ষা এবং অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া শিক্ষকগণ বিস্মিত হইতেন। তিনি কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক পড়িয়াই নিরস্ত হইতেন না, কালেজের পুস্তকালয়ে গিয়া সর্ব্বদাই ভাল ভাল পুস্তক পড়িতেন। হুগলী কালেজ হইতে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বিশেষ প্রসংশার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কোন অধ্যাপকের নিকট চারি বৎসর কাল সংস্কৃত পাঠ করেন। কালেজে পাঠকালে সকল শিক্ষকের মুখেই তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কেবল সাহিত্যে নহে, অঙ্কশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। হুগলী কালেজে পাঠ শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন ও আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ১৮৫৮ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম বি, এ, পরীক্ষা প্রচলিত হয়। তখন বঙ্কিমের বয়স কুড়ি বৎসর। তিনি আইন পড়িতে পড়িতেই বি, এ, পরীক্ষা দিলেন এবং অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ। বি, এ, উপাধি তখন এদেশে এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে বঙ্কিম বাবুকে দেখিবার জন্য বহুক্রোশ দূর হইতে লোক আসিত এবং বঙ্কিম বাবু শিক্ষিতগণমধ্যে মুখোজ্জ্বলকারী বি, এ, বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। বি, এ, পাশের পরেই ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া পাঠাইলেন, কাজেই তাঁহার আর আইন পাশ দেওয়া হইল না।

বঙ্কিম চিরদিনই স্বদেশানুরাগী ছিলেন। পরের জিনিস অপেক্ষা যে ঘরের জিনিস ভাল, একথা শিক্ষিতগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও মাতৃভাষার সেবাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল। শৈশব হইতেই বঙ্গভাষার উপর তাঁহার

অনুরাগ লক্ষিত হইত। তিনি কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অতি আগ্রহের সহিত পড়িতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় তিনি "মানস ও ললিতা" নামক কবিতা রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার কবিতা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। সেই দিন হইতে বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইলেন।

১৮৬১ খৃঃ তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচিত ও তৎপর বর্ষে তাহা প্রকাশিত হয়। যদিও ইংরাজীআদর্শে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উদ্যমেই তিনি বঙ্গভাষার উপর অসাধারণ আধিপত্য ও চরিত্রচিত্রণে অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। উপন্যাস লিখিয়া এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে এরূপ সার্থকতা ঘটে নাই। তাহার পূর্ব্বে তিনি ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক পত্রিকায় রাজমোহনস্ ওয়াইফ নামক একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ঐ পত্রিকা উঠিয়া যাওয়ায় তাঁহার ইংরাজী উপন্যাস খানিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি যে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকায় জেনেরল্ এসেম্বলির ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবের সহিত বঙ্কিমের যে মসীযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ইংরাজী লেখা পড়িয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টি সাহেবও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন, "এত দিন পরে বাঙ্গালায় একজন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছি।" সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু নানা কারণে তিনি সে পদ ত্যাগ করেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের সহিত বঙ্কিমের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহার পরে ১৮৬৭ খৃঃ মৃণালিনী বাহির হইল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সহিত যেন বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল ও সেই

সঙ্গে বঙ্গভাষার লেখকগণের রুচিও পরিবর্ত্তিত হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট বঙ্গদর্শনের যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, কোন সাময়িক পত্রিকার এরূপ সমাদর দেখা যায় নাই। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে বঙ্কিম নব্য লেখকের শ্রেষ্ঠ অনেক লেখককেই লিখিবার পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন এবং নিজেও বঙ্গদর্শনে বহু প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বঙ্গভাষাকে আপন মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিতেন, বটতলার পুঁথি দেখিয়া যাঁহারা নাসিকাকুঞ্চন করিতেন, ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থই যাঁহাদের একমাত্র বেদ-স্বরূপ ছিল, স্বদেশের ভাল ফেলিয়াও বিদেশীয় মন্দের অনুকরণই যাঁহাদিগের জীবনের ব্রতস্বরূপ ছিল—সেই উদ্ধত কৃপাপাত্র নব্যবঙ্গকে বঙ্কিমবাবুই বঙ্গভারতীর মন্দিরে উপস্থিত করিয়া সেই চরণে অর্ঘ্য দিতে বাধ্য করেন। সেই অবধি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণই বঙ্গভাষার সেবকগণের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই জন্য তিনি "বঙ্গভাষার সম্রাট" পদবাচ্য। তিনি বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন—১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা, ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়, ১২৮১ সালে রজনী, ৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৬ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭ সালে আনন্দমঠ ও মুচিরাম গুড়ের জীবনী, ১২৮৮ সালে দেবী চৌধুরাণী। ১২৮৪ সালে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হন। সঞ্জীবের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়। সীতারামের প্রকৃত চিত্র তাঁহার তুলিকায় ভিন্নরূপে চিত্রিত হইলেও তাঁহার জীবনে যে সন্ন্যাসীরূপী মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সীতারামে তিনি সেই চিত্রই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখাল বাবু "প্রচার" নামে এক মাসিক পত্র বাহির করেন, এখানিও বঙ্কিম বাবুর মতানুসারে বাহির হয় প্রচারে বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র,

সীতারাম ও গীতামর্ম্ম এবং নবজীবনে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ডেপুটীকার্য্যে ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার অত্যন্ত সুনাম ছিল। তিনি যথাকালে পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। অবসর কালে তিনি অধিকাংশ সময় সাহিত্যসেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিতেন।

তাঁহার পুত্র হয় নাই, দুইটী কন্যা জন্মে। অবসর গ্রহণের পরও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম জন্য তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। অবশেষে ১৩০০ সালের ২৬ চৈত্র অপরাহ্ন ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বহুমূত্র-জনিত জ্বর ও মূত্রনালীর বিস্ফোটক রোগে বঙ্গের সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা আর পূরণ হইবার নহে।

কি ইতিহাস, কি সাহিত্য, কি গণিত সকল বিষয়েই তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শীতা ছিল। কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকলের কাছেই তিনি সমান স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য বা জাতীয়তা না হারাইয়া বাঙ্গালী কিরূপে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা লাভ করিতে পারে, বঙ্কিম চন্দ্র তাহার আদর্শ। বাঙ্গালীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ধর্ম্ম ও সামাজিক মত সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনুক্রমণিকা মাত্র। বঙ্গের ভাবী আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি যে "বন্দে মাতরম্" গাহিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর দ্বাদশবর্ষ পরে আজি তাহা ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীত রূপে কোটী কোটী কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছে।

বঙ্গমাতার যে মূর্ত্তি বঙ্কিমের মনশ্চক্ষে সমুদ্ভাসিত ছিল, তাহার আভাস কমলাকান্তের দপ্তরে "আমার দুর্গোৎসবে" সূচিত হইয়াছে। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" গানে জাতীয় হীনতাসূচক কাতরোক্তি নাই, তাহাতে সুদূর অতীত গৌরবের স্মৃতির শক্তিহীন নিশ্চেষ্ট স্পর্দ্ধা নাই। বাঙ্গালীর

অভ্যন্তরে যে মহাশক্তি লুক্কায়িত, "বন্দে মাতরম্" গানে বঙ্কিম বাবুই তাহা আবিষ্কার করেন। সেই জাতীয়শক্তি এখন আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যেন তাঁহার জীবনী প্রকাশিত না হয়, তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং বাঙ্গালীমাত্রের নিকট তিনি এই প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বজীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া তদীয় মৃত্যুর দ্বাদশবর্ষ পরে যেন একখানি বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাঁহারি দৌহিত্রগণের প্রতি তাঁহার এই আদেশ আছে। এখন দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাই এখন বঙ্গবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের আত্ম-কাহিনী সম্বলিত বিস্তৃত জীবনীর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৭৪৭ শকে (১৮২৫ খৃঃ) ২ ফাল্গুণ কলিকাতায় ভূদেবের জন্ম হয়। ভূদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, খানাকুলকৃষ্ণনগর ইঁহাদের বাসস্থান ছিল ; বিশ্বনাথ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

ভূদেব অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিন বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। পরে তাঁহার ইংরাজী ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হওয়ায় তিনি প্রথম দুই বৎসর অপর বিদ্যালয়ে পড়িয়া শেষ ছয় বৎসর হিন্দু কলেজে পড়েন। এখানে তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি তিনি অনেক কষ্টে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিয়া পুত্রকে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাদানে পশ্চাৎপদ হন নাই।

এই হিন্দু কলেজের ষষ্ঠ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠকালে ভূদেবের অতিরিক্ত

পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি প্রাতে আহারের সময় গণিয়া চৌদ্দ গ্রাস ভাত ও রাত্রিতে অল্প পরিমাণে সাগু মাত্র আহার করিতেন। তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতেন বলিয়া এইরূপ লঘু আহার করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে আতপ তণ্ডুল, গব্য ঘৃত ও দুগ্ধের অভাব ছিল না, সুতরাং এইরূপ অল্প আহারেও তাঁহার শরীরের কোন হানি হয় নাই। অতিরিক্ত ভোজন মানসিক পরিশ্রমের পক্ষে ব্যাঘাতজনক বলিয়াই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে লঘু আহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। হিন্দু কলেজে তখন দুইটী বিভাগ ছিল, একটী সিনিয়র বিভাগ, অপরটী জুনিয়র বিভাগ। প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সিনিয়র বিভাগ এবং ষষ্ঠ হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত জুনিয়র বিভাগ। এই সময়ে সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র ও তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভূদেব পঞ্চম শ্রেণী হইতেই জুনিয়র পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া বৃত্ত পান। পঞ্চম শ্রেণী হইতে ভূদেব একবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার নিম্নলিখিত বন্ধু ও সহপাঠীগণও পঞ্চম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন : মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, শ্যামাচরণ সাহা, হরিদাস দত্ত এবং বঙ্কুবিহারী দত্ত। পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে এই প্রথম এবং এই শেষ। ইহার পূর্ব্বে বা পরে ঐ কলেজের আর কোন ছাত্র একবারে তিন শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উন্নীত হয় নাই।

ভূদেবের বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রমপটুতা ও কার্য্যতৎপরতা দর্শনে তাঁহার শিক্ষকগণ সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ভূদেবের প্রতি তাঁহার শিক্ষকগণের স্নেহ ও যত্নের একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে ভূদেব একদিন কলেজে আসিয়া দেখিলেন, কলেজ বসিবার তখনও বিলম্ব আছে। তাঁহার শরীরটা সেদিন ভাল না থাকায় তিনি অধ্যাপক সাহেবদিগের কামরায় যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক হ্যালফোর্ড সাহেব যথা সময়ে কামরায় আসিলেন এবং ভূদেবকে ঘুমাইতে দেখিয়া অমনই আস্তে আস্তে দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন ও বেহারাকে বলিয়া আসিলেন যে, "দেখো, ছেলেটীর যেন কোনমতে নিদ্রা ভঙ্গ না হয়।" বেলা দেড়টার সময় অধ্যাপকগণ টিফিনের জন্য কামরার কাছে যাইয়া বেহারার কাছে শুনিলেন যে ভূদেব তখনও ঘুমাইতেছেন, সাহেবেরা ভূদেবের ঘুম না ভাঙ্গাইয়া সকলেই আপন আপন ক্লাসে বসিয়া টিফিন করিলেন। বেলা দুইটার সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং নিদ্রা-বস্থায় যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি বেশী পরিশ্রম কর, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া অধ্যয়ন কর, তোমার যে একটু ভাল ঘুম হইয়াছে তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

ইহার পরে ভূদেব কলেজ ত্যাগ করিয়া শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া নিজেই শিক্ষকতা করেন। কিন্তু উহাতে যেরূপ লোকবল ও অর্থবল থাকা প্রয়োজন তাহা না থাকায় ভূদেবকে ঐ সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়। ইহার অল্পদিন পরেই ৫০৲ টাকা বেতনে তিনি মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার ন্যায়পরতা, কার্য্যদক্ষতা, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে দেড়শত টাকা বেতনে হাবড়া গবর্ণ-মেণ্টের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। এখানে তাঁহার আদর্শ শিক্ষকতা গুণে অনেক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করে। এই সময়ে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও উক্ত স্কুলের সম্পাদক হজসন্ প্রাট সাহেবের সহিত ভূদেবের পরিচয় হয়। প্রাট্ সাহেব ভূদেবের

অতুলনীয় গুণরাশিতে মুগ্ধ হইলেন। সাহেব যখন দক্ষিণ বাঙ্গালার স্কুল ইনস্পেক্টর হন, সে সময়ে কর্ত্তব্য বিষয়ে ভূদেবের নিকট অনেক পরামর্শ লইতেন। তিনি যখনই যে স্থানে কর্ম্ম করিতেন, তখনই সে স্থানের কি সাহেব কি বাঙ্গালী সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা করিত এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুজ্ঞানে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত ও বিশ্বাস করিত। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ভূদেবের বরাবরই নিরতিশয় অনুরাগ দেখা যাইত। প্রাট্ সাহেবের উৎসাহ ও প্ররোচনায় তিনি 'শিক্ষাবিষয়ক' নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন; ঐ সময়েই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়।

হুগলীতে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে ভূদেব ৩০০, টাকা বেতনে তাহার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। তাঁহার নিরতিশয় যত্ন ও চেষ্টায় হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। ভূদেব বালকদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য এই সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের জ্যামিতি তিন অধ্যায় প্রকাশ করেন। এই সময়েই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ জুনমাসে মেডলিকট সাহেব প্রতিনিধি স্কুল-ইনস্পেক্টর হইলে ভূদেবও ৩০০, টাকা বেতনে তাঁহার সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেডলিকট ভূদেবকে বড় ভালবাসিতেন। ইহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০০০০, টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাকা এতদিন ব্যয় হয় নাই। এখন মেডলিকট্ সাহেব শিক্ষাবিস্তারের জন্য ভূদেবের পরামর্শে সেই টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। ভূদেবের নিরতিশয় যত্ন ও আগ্রহে শিক্ষকগণকে শিক্ষাদানে উপযুক্ত করিবার জন্য কয়েক স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও তদধীনে গ্রাম্য পাঠশালাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৬৩ খৃঃ ভূদেব স্কুলসমূহের এডিশনাল ইনস্পেক্টর হইলেন। তিনি হিন্দুগণের প্রাচীন

শিক্ষা প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। সেই প্রাচীন আদর্শে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া তিনি পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কৃতকার্য্য ও শিক্ষাবিভাগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ বৈশাখ মাস হইতে নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ভূদেব দুই আনা মূল্যের শিক্ষাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। এই পত্র কয়েক বর্ষ বেশ চলিয়াছিল, ১৮৬৯ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুর সহিত পত্রখানিও উঠিয়া যায়।

১৮৭৫ খৃঃ এপ্রিল মাসে ভূদেব পশ্চিম সার্কেলের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই মে মাসে তিনি উচ্চশিক্ষা সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৭৬ খৃঃ নবেম্বর মাসে পশ্চিম সার্কেল, বিহার সার্কেলের ভারও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ঐ সময়ে তাঁহারই চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট কতিপয় সহকারী ইন্‌স্পেক্টরের পদ মঞ্জুর করেন। সেই সহকারী ইন্‌স্পেক্টরগণের সাহায্যেই ভূদেব উভয় সার্কেলের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে পারিয়াছিলেন। ভূদেব বেহারের ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ফ্যালন ও ক্রফট্‌ সাহেব তথাকার ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। ভূদেব উক্ত প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর হইবার কথা হইলে, বেহারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'আঁতে হে বাঙ্গালী, বেহারীকে দুখ্‌ দায়ী" (বাঙ্গালী আসিতেছেন, এইবারে বেহারীদের কষ্ট হইবে।) কিন্তু ভূদেবের কার্য্যপ্রাপ্তির অল্পদিন পরেই বেহার প্রদেশের সকল প্রকার লোকই ভূদেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ভূদেবের উদার হৃদয়ে বাঙ্গালী বেহারীর তফাৎ, হিন্দু মুসলমানের তফাৎ নাই। তিনি ভারতমাতার সকল সন্তানেরই হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী সাহেব ছিলেন না। তিনি বেহারীদের সহানুভূতি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী হইলেও আপন কর্ত্তব্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক বিহারী কর্ম্মচারীকে নানারূপ বিপদ

হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ানগণ হঠাৎ কোন হুকুম জারি করিলে তিনি নিজে গিয়া লঘুপাপে গুরুদণ্ড দান হইতে তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়াছেন, অথচ প্রকৃত দুষ্টের দমনে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। বেহারে কার্য্যকালে তথাকার বন্দোবস্ত ভাল করিবার জন্য ভূদেব অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। বেহারী ছাত্রগণের তখন ভাল পাঠ্যপুস্তক না থাকায় তিনি বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক হইতে অনেকগুলি পুস্তক হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত করান। লেখকদিগের উৎসাহবৃদ্ধিহেতু প্রাইমারী গ্রাণ্ট হইতে ছাত্রবর্গকে পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ জন্য নবপ্রকাশিত ঐরূপ গ্রন্থ একবারে এত কিনিয়া লইতেন যে লেখকগণের ঐ সমুদয় পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতির ব্যয় তাহা হইতেই উঠিয়া যাইত; পরে যাহা বিক্রীত হইত, তাহার সমস্তই লাভের মধ্যে থাকিত। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস, নীতিপথ, পুরাবৃত্তসার, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত অংশ প্রভৃতি এই সময়ে হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালায় যেরূপ দেশীয় বড়লোকদিগের কথা এদেশীয় বালকগণ জানিতে পারার জন্য পূর্ব্বে চরিতাষ্টক নামক গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেহার দর্পণ নামে বিহার প্রদেশেরও বড় বড় লোকদিগের একখানি জীবনী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দী সাহিত্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি যাহাতে স্থগিত না হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত প্রদেশ সমূহে হিন্দীভাষা প্রচলনের প্রয়োজন বুঝিয়া, তদানীন্তন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আশলি ইডেন সাহেবকে ঐ বিষয়ে পরামর্শ দেন। "ভারতবাসী ভদ্রলোকদিগের এখন বর্ত্তমান রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহা শিখিবে, আবার সাবেক মুসলমানী রাজত্বের চিহ্নস্বরূপ উর্দ্দু শিখিবে, আবার মাতৃভাষা হিন্দী শিখিবে, ইহাতে বড়ই চাপ পড়ে। বাঙ্গালার আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠিয়া গিয়া অবাধ বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বাড়িয়াছে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন।" এই সকল কথা বুঝাইয়া

দিলে ইডেন সাহেব বেহারে হিন্দী প্রচলনে রাজী হন। উর্দ্দু উঠাইয়া একবারে নাগরী অক্ষর বসাইতে গেলে মুসলমান ও কায়স্থগণের বিশেষ আপত্তি জন্মিবে বলিয়া জমিদারী ও মহাজনী কাজে হিন্দু মুসলমান সকলের সেরেস্তাতেই যে কায়েথী অক্ষর চিরকাল প্রলিত আছে, তাহারই প্রচলন জন্য ভূদেব পরামর্শ দেন। গ্রিয়ারসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে কয়েক প্রকার অক্ষরের লেখা একত্র করিয়া সাধারণ প্রচলিত ছাঁদগুলি বাছিয়া লইয়া তাহা হইতে এক প্রস্থ সরকারী কায়েথী অক্ষরের ঠিকানা করেন। তাহা হইতে ছাপা সরকারী কায়েথী অক্ষর প্রস্তুত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ এপ্রিল মাসে তিনি "নর্থ সেণ্ট্রাল" নামক নব প্রতিষ্ঠিত বিভাগের ডিভিজনাল ইন্স্পেক্টর (বিভাগীয় পরিদর্শক) পদে নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন পরে শিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হইলেন। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বিশেষ অর্থ সাহায্যে এডুকেশন গেজেট সম্পাদন করিতেন। কোন একটী রেল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে প্যারীচরণ স্বাধীন মত প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়, সেই জন্য প্যারীচরণ সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলে ভূদেব গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া ১৮৬৮ খৃঃ এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন; এখনও ভূদেব বাবুর চুঁচুড়াস্থ বাটী হইতে ঐ পত্রিকা নিয়মিত রূপে বাহির হইতেছে। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮২ খৃঃ তিনি ছোটলাটের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ জুনমাসে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" ও কিছুদিন পরে তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রকাশিত হয়; এই পারিবারিক প্রবন্ধই তাঁহার জাতীয় জীবনের বিশালকীর্ত্তি।

১৩০১ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি একটার সময় ভারতের অলঙ্কার কর্ম্মবীর ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সত্যই ভারতমাতা একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছেন।

ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত বিশেষ সংলিপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান ভূদেব আপনার জাতীয়তা হারান নাই। যে সময়ে পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত বঙ্গীয় সমাজ ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজের অনুকরণের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, সে সময় স্বজাতী প্রিয় ও স্বধর্ম্মানুরাগী মহাপুরুষ ভূদেব ব্রাহ্মণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্নবান ছিলেন, ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "আচারপ্রবন্ধে" তিনি স্বীয় মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—

"জাতীয়তা সাধনের জন্য হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুত্ব ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরাজ কার্য্য-কুশল, অহঙ্কারী ও লোভী; হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরাজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরাজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। অপর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।" উদ্ধৃত কয়েক ছত্রেই তাঁহার উচ্চ মন ও লোকশিক্ষার পরিচয় সুপ্রকাশিত। তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক, জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। তিনি হিন্দুজাতিকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য "আচার প্রবন্ধ" প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"সদাচারই মূলধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতজনক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয় (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকর-

পের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য (৫) স্বাভাবিক আলস্য। শাস্ত্রাচার লোপের উল্লিখিত তিনটী হেতুই আগন্তুক। ওগুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধিসকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও লোকের অনেকটা শাস্ত্রজ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধি পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে ও যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োধিক ও চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলে, ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। (৩) আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সংবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"

ভূদেব অনেক সময় দুঃখ করিতেন যে উপযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষার অভাবেই আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এত অবনত ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্যই হিন্দু সমাজও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণপ্রবর ভূদেব জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্য নিজ পিতৃনামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক লক্ষ বাটি হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে কার্য্যকালে গঙ্গার ধারে একখানি মনোহর ও সুবৃহৎ বাটী প্রস্তুত করেন, সেই বাটী সংলগ্ন বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে এখনও

১২।১৪টী ছাত্র আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হয় এবং বিনা বেতনে পড়িতে পায়। বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি কখনও জানিতেন না। তাঁহার ছাত্রজীবনও যেরূপ বিলাসিতাশূন্যতা ও মিতব্যয়িতায় অতিবাহিত হইয়াছে, যুবাবয়সে ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্যা এবং জ্ঞানে অত্যুচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াও তিনি সেইরূপ ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ভূদেবের চন্দননগরের বিদ্যালয়ে অবস্থান সময়ের তাঁহার কোনও প্রাচীন বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত কয়েকটী কথা এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"এক্ষণে আমার বয়স ছষট্টি বৎসর। ১৮ বৎসর বয়সে স্কুল পরিত্যাগ করি। স্কুল ছাড়ি বটে, কিন্তু ঘরে বিবিধ ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন চেষ্টায় নিরত থাকি। ঐ সময়ে একদিন আমার প্রতিবাসী ও প্রিয়বন্ধু ৺স্বরূপদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ভূদেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তৎপূর্ব্বে স্বরূপের মুখে তাঁহার কিছু কিছু গুণানুবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার আমার ইচ্ছা হয়। ভূদেব তখন হিন্দু কলেজের একজন সিনিয়র স্কলার, প্রায় চারি বৎসর কাল একাদিক্রমে মাসে ৪০৲ টাকা ছাত্রবৃত্তি পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে প্রথম দেখিবামাত্র আমার মনোমধ্যে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল, আলাপ পরিচয়ে তাহার বৃদ্ধি বই আর হ্রাস হইল না। স্বরূপের সহিত তাঁহার বাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম; ক্রমশঃ পরস্পর প্রণয় গাঢ় হইয়া উঠিল, এত গাঢ় হইল যে দূরে দূরে দেখা শুনায় আর যেন তৃপ্তি লাভ হইত না। প্রতি দিন প্রাতে বা সায়াহ্নে, হয় তাঁহার বাটীতে না হয় স্বরূপের বাটীতে তিন জনে একত্রিত হইতাম। ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে ও নানাবিধ সদালোচনায় প্রায় তিন চারি ঘণ্টা অতি-বাহিত করিয়া বাটী ফিরিতাম। এমারসনের প্রবন্ধাবলী আমাদের একখানি প্রধান পাঠ্যপুস্তক ছিল। ঐ গ্রন্থখানির বিষয় তৎকালে অনেকে জ্ঞাত ছিলেন না; স্বরূপ রামগোপাল ঘোষের পুস্তকালয় হইতে উহা

আনয়ন করেন। ঐ পুস্তক অধ্যয়নে আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। আমি যে উহার সকল অংশ সমানভাবে বুঝিতাম এমন নহে; তবে যতটুকু বুঝিতাম, তাহাতেই আমার বিশেষ তৃপ্তিলাভ হইত। আমাদের অন্তঃকরণ তখন নবোৎসাহে উথলিয়া উঠিয়াছিল।"

"এইরূপে এক বৎসর গত হইলে ইংরাজী ১৮৪৬ বা ১৮৪৭ সালে ভূদেব কলিকাতা ছাড়িয়া চন্দননগরে আসিয়া এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ স্কুলে যে কয়জন শিক্ষক ছিলেন, তাঁহারা কেহই বেতন পাইতেন না। বিদ্যালয়ের আয়ে তাঁহাদের আহারাদি কোনরূপে নির্ব্বাহ হইত মাত্র। স্কুলের জনৈক অবৈতনিক শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় স্বরূপের নিকট স্বরূপেরই কোন স্বজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভূদেব আপন ভগিনীপতি ৺বামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনিবার জন্য পাঠান। রামও চন্দননগরের বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষকদলভুক্ত ছিলেন। রাম যাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তিনি চন্দননগরে যাইতে অস্বীকার করায় রাম হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, ইত্যবসরে আমি অবগত হইলাম যে ভূদেব তাঁহার চন্দমনগরস্থিত স্কুলের জন্য একজন শিক্ষক খুঁজিতেছেন। জ্ঞাত হইবামাত্র এই সুযোগে পুনরায় ভূদেবসঙ্গ পাইবার পক্ষে প্রবল ইচ্ছা হইল। সংবাদদাতাকে বলিলাম "আমি যাইব," তিনি কহিলেন "তবে আর বিলম্ব করিও না রামকে ধর, সে এখনও ষষ্ঠীতলা পার হয় নাই।" দ্রুত বাটীর বাহির হইয়া রামকে ধরিলাম এবং তাঁহারে নিকট আমার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলাম। রাম আমাকে পূর্ব্বে জানিতেন, আমার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "তোমার নিকট লোক পাঠাইব, তাহার সঙ্গে চন্দননগরে যাইবে" আমি "বেশ" বলিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিলাম।"

"কোন সাংসারিক ঘটনা বশতঃ ঠিক ঐ সময় বাটী ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে আমার ইচ্ছাও হইয়াছিল। দেড় বৎসর বয়সে আমার পিতৃ

বিয়োগ হয়। আমি আমার মাতার একমাত্র পুত্র ছিলাম, তিনিও নিঃস্ব ছিলেন না। চন্দননগরে যাইবার তিনিও মত দিলেন না, যাহা হউক দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহার অমতেই আমি চলিয়া গেলাম।"

"শীতকাল, রবিবার তৃতীয় প্রহরের সময় চন্দননগরস্থিত ভূকৈলাস রাজভবনের সন্নিকটস্থ বাঁধাঘাটে আসিয়া আমার নৌকা লাগিল। পূর্ব্বে আমি কখনও চন্দননগর দেখি নাই। দুর্গন্ধময়, অপরিষ্কৃত, অনবরত কোলাহলপূর্ণ কলিকাতায় থাকা অভ্যাস; সুতরাং নিস্তব্ধপ্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঐ সুন্দর নগরটী দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। ঘাটে নামিয়া পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে স্কুলগৃহে উপস্থিত হইলাম। ভূদেব তাঁহার সহকারীগণের সহিত ঐ গৃহের একটী প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন, আমায় দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তিনি তখন রামের পিতার অনুরোধে দায়ভাগের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহার গাত্রে একখানি সামান্য বনাত ছিল, পরিধেয় বস্ত্রও সামান্য ছিল। সহসা উঠিয়া অঙ্গন স্থিত একটী ফুলগাছের ফুল পাড়িয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। আমিও উহাতে যোগ দিলাম। তাহাতে তিনি যে আমায় লইয়া চলিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস কতকটা তাঁহার জন্মিল। বহুদিন পরে একথা তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করেন। এস্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যদি তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল তবে কার্য্যক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার সন্দিহান হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, দিবারাত্রি একত্র বাস করিয়া কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক একমনে কার্য্যবিশেষ সাধন করা আর মধ্যে মধ্যে দেখা শুনা অথবা একত্র বসিয়া পুস্তক পাঠ কিম্বা সদালাপ দ্বারা দুই চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করা, এতদুভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন আমি অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ছিলাম, কখনও গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাই নাই সুতরাং চন্দননগরের বিদ্যালয়ের বিপরীত ভাব আমার পক্ষে কিরূপ প্রীতিকর হইবে, ইহা সহজেই তাঁহার সন্দেহের

বিষন্ন হইয়াছিল। যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যেই এই নূতন অবস্থা আমার অভ্যস্ত হইল। এক তরকারী ভাত খাইয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলাম। কিন্তু একটু মাখাচোখা ব্যতিরেকে ভাত গেলা কঠিন হইত, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম "ব্রজ, জল দিলেই ত ঝোল হয়, তবে এ ঝোল কেনই না হয়?" আমার এই উক্তি ভূদেবের যাবজ্জীবন স্মরণ ছিল। আমার সহিত যখন দেখা হইত, তখনই সহাস্যবদনে উহার পুনরুক্তি করিতেন।"

"চন্দননগর স্কুলে যে কয়দিন ছিলাম, সে কয়দিন অতিসুখে কাটাইয়াছিলাম। আমরা সকলেই পবিত্রমনে সতেজে সম্মুখে একই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কালাতিপাত করিতাম, গঙ্গার দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে সুবিধামত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করাই সেই লক্ষ্য। এখন যেমন স্কুলের ছড়াছড়ি, তখন সেরূপ ছিল না; রাজধানী ও প্রধান নগর ভিন্ন অপর কোন স্থানে ইংরাজী স্কুল বড় দেখা যাইত না। এই অভাব মোচন করিবার ইচ্ছা ভূদেবের উন্নত অন্তঃকরণে উদ্দীপিত হইয়া তাঁহার সহচরগণেরও হৃদয়াধিকার করিয়াছিল। এ বিষয় আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম ক্রমে বলিব। এক্ষণে চন্দননগর স্কুলটী কি প্রকার ছিল ও আমরা তথায় কিরূপে থাকিতাম, তাহারই সংক্ষেপ বর্ণনা করি।"

"স্কুলের নাম চন্দননগর সেমিনারি, ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক শত, মাসিক আয় ন্যূনাধিক ৮০৲ টাকা। ঐ আয়ের দ্বারা বাড়ীভাড়া, মালীর ও বিলসরকারের মাহিয়ানা ও শিক্ষকদিগের আহারীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। প্রথম শ্রেণীতে রিচার্ডসনের সিলেক্‌সন্ প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক ছিল। ভূদেব স্বয়ং ঐ শ্রেণীতে শিক্ষাদান করিতেন; স্কুলের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটী নামমাত্র সমিতি ছিল। তেলিনীপাড়ার ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, খালসিয়ার দ্বারকানাথ বসু, গোন্দালপাড়ার ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ঐ সভার সদস্য ছিলেন। স্কুল সম্বন্ধে অনাস্থা

প্রযুক্ত ইহারা কখন কখন আমাদিগের নিকট মিষ্ট ভর্ৎসনা খাইতেন এবং তজ্জন্য আমাদিগকে কথঞ্চিৎ ভয়ও করিতেন। ফলতঃ তোষামোদ কাহাকে বলে আমরা জানিতাম না। স্পষ্ট কথা কহাই আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। একদা ভূদেব, আমি ও রাম বেলা অনুমান তৃতীয় প্রহরের সময় গোন্দলপাড়ার গোপাল বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হই; দেখি বাবু তখন ঘুমাইতেছেন; নিকটে এক জন ভৃত্য ও দুই জন পারিষদ বসিয়া আছেন। বাবুর যাহাতে সত্বর নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই অভিপ্রায়ে আমরা একটু উচ্চরবে কথোপকথন করিতে লাগিলাম, পারিষদেরা নিবারণ করিল; কিন্তু তাহা না শুনিয়া বরং এক গ্রাম আরও চড়াইয়া দিলাম, দিবা-নিদ্রা যে নিন্দনীয়, আমাদের দেশীয় বড়লোকেরা যে আহার ও নিদ্রা এই দুইটীই ভাল বুঝেন, এই সকল কথাবার্ত্তাই চলিতে লাগিল। এমন সময় গোপাল বাবু শয্যা হইতে উঠিয়া শশব্যস্তে আমাদিগের সম্ভাষণ ও সমাদর করিলেন; পারিষদেরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইল। আমরা স্কুলে ফিরিলাম। স্কুল সমিতির সদস্যদিগের সকলের সহিত বিশেষতঃ গোপাল বাবুর সহিত ভূদেবের যাবজ্জীবনস্থায়ী সৌহার্দ্দ্য ঘটিয়াছিল।”

“আমরা প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পালাক্রমে উচ্চৈঃস্বরে একেন সাইড, পোপ, সেক্সপিয়র ও মিল্টন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবিগণের রচিত কাব্য গ্রন্থের আবৃত্তি করিতাম। স্কুলগৃহের পার্শ্বেই একজন ভদ্র কেরাণী বাস করিতেন। তিনি আমাদিগের আবৃত্তি শুনিয়া আমাদের সহিত আলাপ করেন। স্নানের সময়ে প্রায় সকলে একত্রেই গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম। গঙ্গায় সন্তরণ করা আমাদিগের নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই ছিল। আমাদের কাহারও পরিধেয় বস্ত্র ছিল না; আলনাতে কয়েকখানা কাপড় ও চাদর ঝুলিত; যিনি যাহা পাইতেন তাহাই পরিধান করিতেন। আমার নিজের কয়েক খানা বেশী কাপড় ও চাদর ছিল, তাহাও ঐরূপে ব্যবহৃত হইত। তাহাতে আমার মনে আনন্দ ভিন্ন অপর কোন ভাবের উদয় হইত না।

আমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল না, সকালে বৈকালে উদর ভরিয়া সামান্য একটী মাত্র তরকারী উপলক্ষ করিয়া কখন কখন বা শুদ্ধ লবণ দিয়া ভাত খাইতাম। ভূদেব নিজে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ বৈকালে প্রায়ই সুজি খাইতেন। মধ্যে মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত হইলে ভূদেব স্বয়ং পাক করিতেন; বস্তুতঃ ঐ বিষয়ে তিনি যেমন পটু ছিলেন, দলের মধ্যে আর কেহই তেমন ছিলেন না। তাঁহার হস্তের অন্ন ব্যঞ্জন বড়ই মিষ্ট লাগিত। বাটনা ব্যতিরেকে শুদ্ধ জলে লঙ্কা ও লবণ দিয়া তিনি যে তরকারী রাঁধিতেন তাহার সুস্বাদ আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। আমরা যে কয়জন একত্র থাকিতাম প্রায় সকলেরই কোন না কোন একটা পীড়া ছিল; চন্দননগরের জলবায়ুর গুণে ও পরিমিত আহার ব্যবহারের গুণে সকলেই অল্পদিনের মধ্যে নীরোগ হইলাম। সায়াহ্নে প্রায়ই চন্দননগর ষ্ট্রাণ্ডে বেড়াইতাম, রাত্রে বড় একটা পড়া শুনা করিতাম না, দুই তিন ঘণ্টা গল্প পরিহাস ও গান করিয়া নিদ্রা যাইতাম। ভূদেবের গলা ছিল না, কিন্তু গান শুনিতে ভাল বাসিতেন ও আমাদিগের সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু স্বর বাহির হইত কিনা সন্দেহ। মালী স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য রাত্রে আমাদিগের ঘরে ছানাবড়া, ফরাসডাঙ্গার মুণ্ডি প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া রাখিত। রাত্রি ৯।১০ টার সময় কোন কোন দিন বেশ ক্ষুধা হইত এবং সকলে মিলিয়া উক্ত মিষ্টান্নের অধিকাংশ খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু মালী তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইত।”

“আমাদিগের চন্দননগরে বাসকালে ভূদেব ও আমি দুই জনে এক সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাতায়াত করিতাম। তৎকালে নৌকা ভিন্ন কলিকাতা যাতায়াতের উপায় ছিল না। ব্যয় লাঘবের জন্য কুঠীর পান্সী অথবা বাঙ্গাল মাঝির গহনার নৌকাতেই যাতায়াত চলিত। কলিকাতা হইতে চন্দননগব আসিবার সময় বাগবাজারের ঘাটে নৌকায় উঠিতে

হইত। কখন কখন ভদ্রেশ্বর পর্য্যন্ত আসিয়া মাঝি বলিত 'এখন ভাঁটা হইয়াছে, আর নৌকা যাইবে না' সুতরাং আমাদিগকে নৌকা হইতে নামিয়া পদব্রজে চন্দননগরে আসিতে হইত। এতদূর চলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হইলেও সঙ্গগুণে বড় একটা কষ্ট হইত না। কখন কখন পিতৃআজ্ঞায় গোঁদলপাড়ায় আপন ভগিনীর বাটীতে দিবার জন্য ভূদেব অম্লানবদনে তত্ত্বের হাঁড়ি হরিতকী বাগান হইতে বাগবাজার পর্য্যন্ত স্বয়ং বহন করিতেন; আমিও অবশ্য তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে ক্রটী করিতাম না। ইংরাজী সন ১৮৬৭ সালে কয়েক জন নূতন ডেপুটী ইনস্পেক্টার নিয়োগজন্য ভূদেব ডিরেক্টর সাহেবের নিকট এক তালিকা পাঠান। সাহেব তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিবার জন্য অতি প্রাতে তাহাকে আহ্বান করেন। তালিকায় আমারও নাম ছিল; আমার সম্বন্ধে সাহেব বলেন, "এ ব্যক্তির বয়স বেশী হইয়াছে—এ যথোচিত পরিশ্রম ও উৎসাহের কার্য্য করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ;" ভূদেব তদুত্তরে বলিলেন, "সে কি? এ ব্যক্তির বয়ক্রম আমা অপেক্ষা কম। যদি আমার উৎসাহ ও শ্রমপটুতার এখনও হ্রাস না হইয়া থাকে, তবে উহার যে হইয়াছে এরূপ মনে করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?" সাহেব নিরস্ত হইলেন। আর এব্যক্তি সম্বন্ধে সাহেব এই বলিয়া একটু আপত্তি করেন "আমি উহাকে একটু জানি, লোকটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছু সন্দেহ আছে, যাহা হউক তুমি উহার চরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিও"; ভূদেব উত্তর করিলেন, "যেমন আপনি আমায় রাখিতেছেন।"

"ভূদেবের অধীনে কার্য্য করিবার অধীনতা ক্লেশ আমায় একদিনের জন্যও সহ্য করিতে হয় নাই। আর আমি প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত যে ভাবে চলিতাম, তাহাতে তাঁহারও আমাকে অধীনস্থ করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিব্রত হইতে হয় নাই। প্রতি বৎসর তাঁহার এলাকার সমস্ত ডেপুটীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ভূদেব আপন বাটীতে সভা করিতেন। ঐ

সভায় স্কুল পাঠশালা সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় আলোচিত এবং মীমাংসিত সমুদায় বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার সাহেবের নিকট প্রেরিত হইত। যে কয়দিবস ডেপুটীগণ তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিতেন সে কয়দিন যেন বাটীতে দুর্গোৎসব হইত, সকলেই আনন্দসাগরে মগ্ন থাকিত। আনন্দময়ী গৃহিনী নানাবিধ আয়োজন করিয়া সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতেন। রাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময়ই বিশুদ্ধ পরিহাস ও আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত হইত। ভূদেবের সহিত আমি একবার বেলুঁট শ্যামদাসপুরে একটী পাঠশালা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলাম। শ্যামদাসপুর বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দূর; তথায় পঁহুছিতে ও আহারাদি করিতে দিবা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তথাপি উভয়ে সজ্জিত হইয়া পাঠশালায় উপস্থিত হইলাম। দুইএকটী বালক আমাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও অতি মৃদুভাবে বেঞ্চ বাজাইবার মত হাত নাড়িতেছিল। ঐ ব্যাপারটী ভূদেবের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র সমীপস্থ কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এ গ্রামে কোন যাত্রার দল কিম্বা অপর কোন সঙ্গীতের কাণ্ড আছে কি?" তিনি উত্তর করিলেন, এখানে এক উৎকৃষ্ট রামায়ণের দল আছে। ভূদেব বলিলেন, আমিও তাই মনে করিয়াছি, নচেৎ পাঠশালায় বসিয়া ছেলেরা বেঞ্চ বাজাইবে কেন?"

"ভূদেব জ্ঞানাবতার ছিলেন বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সুমধুর বাক্যস্রোতে কে না মুগ্ধ হইত? তাঁহার চিন্তাশীলতা, বহুদর্শীতা, দূরদর্শীতা ও মৌলিকতার পরিচয় তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধ ও পারিবারিক প্রবন্ধেই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার হৃদয় সদাশয়তা ও স্বদেশানুরাগে পূর্ণ ছিল। তাহাতে পরত্বের ভাগ কি পরিমাণে নিহিত ছিল, নিম্নলিখিত গল্পটীতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। একদা তিনি, আমি ও আমার এক পুত্র তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে নিম্নতলের বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে ওপারে গরিফার কলের চিম্‌নির উপর

তাঁহার দৃষ্টিপাত হওয়ায় বলিলেন; "যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই উহার উচ্ছেদ সাধন করিতাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটার উপর এত রাগ কেন? তিনি উত্তর করিলেন, কারখানাটা কি আমাদের দেশীয়? পরক্ষণেই একখানা বাষ্পীয় পোত ভীষণ শব্দে গঙ্গা তোলপাড় করিয়া উজান যাইতেছিল, আর অনতিদূরে কয়েক খানা মহাজনী নৌকা নীরবে নিরীহ ভাবে ধীরে ধীরে কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিল। এতদুভয়ের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "দেখ দেখ, একের কি ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্ত্তি ও অপরের কি অনির্ব্বচনীয় শান্ত প্রকৃতি; উহাদিগের পরস্পরের বিপরীতভাব আপনাপন অধিকারীগণের বিপরীত জাতীয় ভাবের কেমন স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে।"

৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক তাঁহার একটী বিদ্বান বন্ধুকে ভূদেব এত ভাল বাসিতেন যে ব্যয়বাহুল্য বশতঃ শরৎ মধ্যে মধ্যে ঋণগ্রস্ত হইলে তিনি নিজের টাকা দিয়া কখন কখন তাঁহার ঋণশোধ করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন যে প্রত্যেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরই প্রতিদিন দরিদ্রদিগকে অর্থাৎ পরোপকারার্থ অন্ততঃ একটী করিয়াও পয়সা দান করা উচিত। ভূদেব নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন।

পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পুরাবৃত্তসার, গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস, শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব ও বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ। ভূদেবের পত্নী অতিশয় বুদ্ধিমতী ও সুগৃহিণী ছিলেন, বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বাংশে ভূদেবের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীই ছিলেন। ভূদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহার পত্নী পরলোকগমন করেন। ভূদেবের তিন পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটী তিনি বর্ত্তমান থাকিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, মধ্যমটী এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ বাবু কেবলমাত্র

এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ভূদেবের উৎকৃষ্ট শিক্ষাগুণে তাঁহার পরিবারবর্গস্থ সকলেই আদর্শজীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার "পারিবাবিক প্রবন্ধ" পাঠ করিলে উক্ত সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভূদেব দেখিতে অতিশয় পুষ্টকায় ও সুপুরুষ ছিলেন। ভারত-অলঙ্কার ভূদেবের মৃত্যুতে বঙ্গভাষার যে স্থান শূন্য হইয়াছে, কোনও কালে আর সে স্থান পূর্ণ হইবার নহে।

রাজনারায়ণ বসু।

১৮২৬ খৃঃ কলিকাতার অন্তঃপাতী বোড়াল নামক ক্ষুদ্র গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নন্দকৃষ্ণ বসু। রাজনারায়ণ বসু রাজা রামমোহন রায়ের একজন পরম সুহৃদ ও ভক্ত শিষ্য ছিলেন। রাজনারায়ণের প্রথম বিদ্যাভ্যাস গ্রাম্য পাঠশালাতেই সম্পন্ন হয়। তৎপরে তিনি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। শুনা যায় ইনি ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষার সময় প্রশ্ন সমূহের এরূপ উৎকৃষ্ট উত্তর দিতেন যে বড় বড় সংবাদপত্রে ঐ সকল প্রশ্নোত্তরের প্রশংসা বাহির হইত। হেয়ারস্কুল হইতে রাজনারায়ণ ১৮৪০ খৃঃ হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ১৮৪২ খৃঃ উক্ত কলেজ হইতে বাহির হন। এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তত্ত্ববোধিনীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন হওয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সহিতও তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তাঁহাদিগেব উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের অকৃত্রিমতা ও

অভিন্নহৃদয়তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যেরূপ জানা যায় তাহাতে সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব অনেক উচ্চাদর্শের বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য রাজনারায়ণ বাবু যখন শিরঃপীড়া বশতঃ বৈদ্য-নাথে বাস করিতেছিলেন, তখন ভুক্তভোগী অক্ষয়কুমার ইঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, কলের জল পান করিবেন, আর ঘটটিকে একটু চালনা করিবেন, আর নিজ হইতে কখনও মাথা ঘোরাই-বেন না"।

১৮৪৪ খৃঃ মে মাস হইতে ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ-নারায়ণ বাবু দ্বিতীয় অধ্যাপকের কার্য্য করেন, তাহার পর মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টারের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে তিনি মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসভায় যে সমুদয় উপদেশ ও বক্তৃতা করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ণ করেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত রাজনারায়ণ বাবু অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নানা রূপ মানসিক পরিশ্রম জন্য তিনি ১৮৭৯ খৃঃ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন লন। তাহার পর ১৯০০ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাজনারায়ণ বসু ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। পক্ষাঘাত রোগে তাহার মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণ বসুর প্রণীত "সেকাল ও একাল", "বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ" প্রভৃতি অনেকগুলি প্রবন্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। "সেকাল ও একাল" নির্ম্মল পরিহাসোজ্জ্বল গ্রন্থ খানি পড়িলে হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের উদয় হয়। রাজনারায়ণ বাবু শিশুর ন্যায় সরল, ধার্ম্মিক এবং বড় মধুর সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। সামাজিক সভা সমিতিতে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বহুলোক অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। তাঁহাকে বিশ্বসংবাদজ্ঞাপক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে "দুই দণ্ড কাছে বসিলেই মনে হইত লোকটী বিদ্যার জাহাজ।" বাল্যকালে পড়াশুনায় রাজনারায়ণ বাবুর এত গভীর অনুরাগ ছিল যে সম্মুখে সহস্র আমোদ প্রমোদ হইলেও তিনি সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিতেন না। যে বয়সে বালকগণ চঞ্চলচিত্ত, পাপপুণ্যবিচারহীন ও অযথা আমোদপ্রমোদে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকে, তিনি সে বয়সে শান্তচিত্ত, ধর্ম্মপরায়ণ ও মহাপণ্ডিত হইয়া মহৎ সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করতঃ সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হেতু ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎ পরিবারের যাবতীয় ভার স্কন্ধে লইতে হইয়াছিল। ইংরাজী ব্যতীত সংস্কৃত, পারসী ও বাঙ্গালা ভাষাতেও তিনি সমধিক পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রেমভাবের অভিব্যক্তি তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ, নারীজাতির উন্নতিসাধন, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বহুতর দেশহিতকর কার্য্যের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি স্বইচ্ছায় বিধবার সহিত স্বীয় দুইটী সহোদরের বিবাহ দেন এবং তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত করেন।

মেদিনীপুরই তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র, এই স্থানের কার্য্যকলাপের জন্যই তিনি সর্ব্বসাধারণের সমধিক যশ ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন তাঁহারই প্রাণগত চেষ্টার ফল। নারীজাতির প্রতি তাঁহার স্নেহ ও ভক্তি শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। ছোট ছোট বালকবালিকাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে নমস্কার করিতেন। তাঁহাকে কেহ কোন দ্রব্য উপহার দিলে তিনি তাহা অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কোন দৌহিত্রী তাঁহাকে একটী অঙ্গুরীয় দিয়াছিল, তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহা হাতে রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "আমার

মৃত্যুর পরে খুকিকে ইহা দিও।" একদিকে তিনি যেমন স্ত্রীস্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন, পক্ষান্তরে তিনি তেমনই উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট সংযতও ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যখন এক সময়ে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া আন্দোলন হয়, তখন আমাকে জনৈক ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, 'বাবা আগুন নিয়ে খেলা, টের পাবা'"। রাজনারায়ণ বসু স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিতেন, "ধর্ম্মেতে গঠিত ক'রে নারীজাতিকে ছাড়িয়া দাও কোন ভয় নাই, যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা। যতক্ষণ না নারীর প্রাণে ধর্ম্মের উদ্রেক হয়, ততক্ষণ তাঁহাদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার সময় নয়"। তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী এবং ইচ্ছানুরূপ যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বাটীতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনা হইত। দেওঘরে তাঁহার নূতন বাটি প্রস্তুত হইলে গৃহপ্রবেশের দিন তিনি সকলকে বাহিরে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইতে বলিয়া যে একটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—"হে পরমেশ্বর! এই গৃহে যদি আমরা সম্পদে উত্থিত হই, তাহার মোহমদে যেন তোমাকে না ভুলি, বরং তুমি তাহার প্রতিষ্ঠাতা এই স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে যেন সুখসৌভাগ্য গ্রহণ করি; আর যদি বিপদে ও দুঃখে পতিত হই, শোকের দারুণ যন্ত্রণায় হৃদয়যন্ত্র নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তথাপি তোমার মঙ্গলবিধানে যেন অবিশ্বাসী না হই। তাহাও মঙ্গলজনক ভাবিয়া বিশ্বাসী থাকি, এবং তাহার ভীষণ যাতনায় যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট না হই।"

দেওঘরে একটা পচা পুষ্করিণীর ধারে কয়েকখানি পর্ণকুটীর ছিল, রাজনারায়ণ বসু একসময়ে ঐ পর্ণকুটীর ক্রয়ার্থে বড়ই উৎসুক হন, পরে যখন দেওঘরে তাঁহার পাকাবাড়ী হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি চাই চালা ঘর, দিলে বড় বাড়ী।" একবার কোন স্ত্রীলোক তাঁহার শিশুকন্যা সমভিব্যাহারে রাজনারায়ণ বসুকে দেখিতে যান, ঐ সময়ে রমণীর শিশুকন্যাটী "মা কোলে লও" বলিয়া আব্দার করে; তাহা দেখিয়া

তিনি হাসিয়া বলেন, "আহা! আহা! জগৎ জননীকে আমরা কবে বলিব মা, মা, কোলে লও।" তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত ও জাতীয়সঙ্গীত শুনিতে এত ভালবাসিতেন যে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। কোনও গায়ক দেওঘরে গিয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র তিনি তাহাকে স্বীয় বাটীতে আনাইতেন এবং এমন ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতেন যে দেখিলে নিতান্ত নাস্তিকের প্রাণেও ভক্তির উদ্রেক হইত। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "আমার ইচ্ছা করে সমস্ত রাত্রিই এইভাবে কেটে যাক, আমার কোন কষ্ট নাই, পরমানন্দে যাপন করিব, কিন্তু তোমাদের পাছে কষ্ট হয় এই আমার ভাবনা, তাই বন্ধ করিতে বলিতেছি।" কেহ যদি জাতীয় সঙ্গীত করিত, অমনি তাঁহার মুখে যুবার ন্যায় এক অপূর্ব্ব শৌর্য্য বীর্য্য লক্ষিত হইত। একবার লাহোরে কংগ্রেসের সময় তাঁহার কোন দৌহিত্রী গাহিতেছিল, "পরদীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" তিনি বলিলেন "ও গান গাস্‌নে, গাস্‌নে, সহিতে পারি না, মন উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়।" মৃত্যুসময়ে গাহিবার নিমিত্ত তিনি চারিটী ব্রহ্মসঙ্গীত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর বন্ধুবাৎসল্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্র বসু লিখিয়াছেন,—"আমার পিতৃদেব অসাধারণরূপে বন্ধুপরায়ণ ছিলেন, বাল্যকাল হইতে যত লোকের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল—প্রায় তাঁহাদের সকলকেই তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় পরলোকগত বন্ধুগণের একটী তালিকা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে একদিন শুনিলেন, একজন বন্ধু চল্লিশ বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন। অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন; পূর্ব্বে আলাপ পরিচয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু সে লোকটীর সে সকল কথা কিছুই মনে হইল না; পিতৃদেব তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ক্ষুব্ধমনে চলিয়া আসিলেন।

খৃষ্টানদিগের সহিত রাজনারায়ণ বসু অনেক দিন তর্কযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নোয়া এবং মোসেস্‌কে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করাতে রাজনারায়ণ বসু উপহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনু ও যাজ্ঞবল্ককে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের তালিকা হইতে খারিজ করিয়া দিলেন, কোন্ অপরাধে?"

মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর হৃদয়খানি যে কিরূপ সরল ধর্ম্মভাব, উদার বিশ্বপ্রেম ও মধুর স্নেহ মমতায় পূর্ণ ছিল, তাহা যাহারা তাঁহাকে একবার দেখিয়াছে ও একবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে তাহারাই তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন অনেক সংকীর্ত্তিপূর্ণ ও বিচিত্র ঘটনাময়। সে সকল বিবৃত করা ক্ষুদ্রশক্তির সাধ্যায়ত্ত নয়; রাজনারায়ণ বসুর তিনটী পুত্র ও চারি কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্র বসুর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন সাহিত্যসেবী ও নির্দ্দোষ ব্যক্তি ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর তিন পুত্রের মধ্যে কেহই বিবাহ করেন নাই এবং কনিষ্ঠা কন্যাও চিরকুমারী আছেন; ইনিও একজন উৎকৃষ্ট লেখিকা। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ বসুর পুত্র কন্যাগণ প্রায় সকলেই পিতার ন্যায় সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সাহিত্যানুরাগী।